হ্যান্‌স্‌ অ্যান্ডারসনের গল্প

খগেন্দ্রনাথ মিত্র



হ্যান্স অ্যাণ্ডারসনের গল্প

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

অনুদিত

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রথম দে'জ সংস্করণ :
ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯
ফাল্গুন ১৩৯৫

HANS ANDERSONER GALPA Rs. 15
BY ANDERSEN HANS CHRISTIAN (1805-1875)
translated by Khagendranath Mitra

প্রকাশক :
সুভাষচন্দ্র দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ শিল্পী :
ধীরেন শাসমল

মুদ্রাকর :
শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিন্টার্স
১৩৮, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৪

দাম : ১৫ টাকা

সূচীপত্র

তুষার-কুমারী ৯
নাইটিংগেল ৪৪
অবিচল টিনের সেপাই ৫৮
কদাকার হাঁসের ছানা ৬৬
চকমকির বাক্স ৮০
উড়ন্ত সিন্দুক ৯৩

খগেন্দ্রনাথ মিত্রের অন্যান্য বই :

গড়জঙ্গলের কাহিনী
পাতালপুরীর কাহিনী
ছোটদের বেতালের গল্প

তুষার-কুমারী

এক

ক্ষুদে রাডি

এবার যাই চলো সুইজারল্যাণ্ডে, ঘুরে বেড়াই সেই মহান্ শৈলময় দেশে, যেখানে খাড়া শিলা-প্রাচীরগুলো আঁকড়ে ধরে আছে অরণ্য।

উঠি গিয়ে চলো আলো-ঠিকরানো তুষার-প্রান্তরে, তারপর নেমে যাই সবুজ উপত্যকায়, যার মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে নদী ও জলধারা —যেন তারা যথেষ্ট দ্রুতবেগে সাগরে পৌঁছতে পারছে না।

সূর্য গভীর উপত্যকায় তপ্ত রোদ ঢালে, আর, ভারী-তুষার স্তূপের ওপর ঝকঝক করে। তার ফলে সেগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দীতে কঠিন হয়ে উজ্জ্বল বরফে পরিণত হয়, অথবা হয়ে যায় খসে-পড়া তুষার-চাঙড়, কিংবা জমে ওঠে তুষার-স্রোত হয়ে।

গিরি-নগর গ্রিন্‌ডেন্‌ওয়ালডের পাশে চওড়া ও পাথুরে গিরিখাতের মধ্যে রয়েছে, এই রকম দুটি তুষার-স্রোত। সে দুটো অতি চমৎকার দেখায়। গ্রীষ্মকালে পৃথিবীর নানা অঞ্চল থেকে তাদের দেখতে আসে বহু বিদেশী।

যে পথটি পাহাড়ের ওপর দিকে উঠেছে, তার দুপাশে কাঠের বাড়ি প্রত্যেকটাতে ছোট ছোট আলুর খেত—তাদের তা থাকতেই হবে। কারণ, ওইসব কুটিরগুলোতে যে অনেক বাচ্চাকে খেতে দিতে হয়। সেই ছোট বাচ্চাগুলো প্রত্যেক জায়গা থেকে উঁকি দেয়। পর্যটকদের চারধারে জড়ো হয়, তা পর্যটকরা পায়ে হেঁটে বা গাড়িতেই যাক। এখানে বাচ্চাগুলো একটা ব্যবসা চালায়—

পাহাড়গুলোতে যে ধরনের বাড়ি তৈরি করা হয় সেই ধরনের বাড়ির খোদাই-করা 'মডেল' বিক্রি করে। বর্ষা বা রৌদ্র যাই হোক তারা আছেই, আর তাদের পণ্য বিক্রির চেষ্টাও করছে।

প্রায় বিশ বছর আগে, একটি ছোট ছেলেকে হামেশাই সেখানে দাঁড়িয়ে তার ব্যবসা চালাতে আগ্রহী দেখা যেতো, যদিও সে দাঁড়াতো সকলের কাছ থেকে একটু তফাতে। তার স্থির-গম্ভীর চেহারা, সেই সঙ্গে সে এত ছোট যে, প্রায়ই বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। তার ফলে তাকে বারবার ইশারার ডাকে এগিয়ে যেতে হতো। আর, তার পণ্যের বেশির ভাগই বিকিয়ে যেতো, যদিও সে বুঝতে পারতো না বিদেশীরা কেন তাকে পছন্দ করে।

তার দাদু যিনি সেই সুন্দর ছোট্ট ঘরগুলি খোদাই করতেন, তিনি বাস করতেন পাহাড়গুলোর মধ্যে কয়েক মাইল তফাতে। বৃদ্ধের ঘরে ছিলো, ছেলেরা যা দেখে মুগ্ধ হয় এমন সব জিনিসে ভরা। একটি কাঠের কাবার্ড—তার মধ্যে প্রচুর খোদাই-করা খেলনা, বাদাম-ভাঙা হাতুড়ি, ছুরি ও কাঁটা, লতা-পাতা ও লাফিয়ে চলা শ্যাময়ের নক্সা-কাটা বাক্স। কিন্তু ছেলেটি, ছাদের কড়ি থেকে যে রাইফেলটি ঝুলতো তার দিকে তাকাতো আরও বেশি আগ্রহের সঙ্গে। কারণ, তার দাদু বলেছিলেন, সেটা একদিন তাকেই দেবেন।

ছেলেটি ছোটো হলেও তাকে ছাগল চরাতে হতো, আর ছাগলের পাল নিয়ে আরও ওপরে উঠতে পারলে যদি ভাল রাখাল হওয়া যায়, তাহলে রাডি ছিল ভাল রাখাল। কারণ, ছাগলগুলোর চেয়েও সে অনেক উপরে উঠতে পারতো।

সে কখনো ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতো না। তার দাদু যখন তাকে খেলনা বেচতে নিচে পাঠাতেন কেবল তখনই তাদের সঙ্গে দেখা করতো। কিন্তু, এই ব্যবসাটা রাডি ঠিকমতো পছন্দ করতো না। তার বদলে পাহাড়গুলোর মধ্যে একা ওঠা-নামা করে, বেড়াতে অথবা তার দাদুর পাশে বসে বৃদ্ধের মুখে সেকালের গল্প কিংবা তার জন্মভূমি

পাশের মেনিন্‌জেন শহরের অধিবাসীদের কথা শুনতে ভালোবাসতো।

অন্যেরাও ছিল, যারা তাকে কিছু শিখিয়েছিলো। তারা সকলেই চার-পেয়ে সঙ্গী। একটা মস্ত কুকুর ছিলো। তার নাম আজ্জোলা। সেটা ছিলো রাডির বাবার। একটা হুলো বেড়ালও ছিলো। এই হুলোটা ছিলো রাডির আসল সঙ্গী, কারণ, তাকে পাহাড়ে চড়তে শিখিয়েছিলো সে।

বেড়ালটা রাডিকে সোজাসুজি বলে, 'আমার সঙ্গে ঘরের চালে উঠে এস।' কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে, যে ছেলে-মেয়েরা কথা বলতে পারে না, তারা হাঁস-মুরগীর ভাষা বোঝে। আর মা-বাবা যেমন করে তাদের সঙ্গে সোজাসুজি কথা কইতে পারেন, কুকুর-বেড়াল তেমনি করে তাদের সঙ্গে কথা কয়। কিন্তু তা হয় ছেলে-মেয়েরা যখন খুব ছোটো থাকে তখনই। 'আমার সঙ্গে চালে উঠে এস।' হয়তো বেড়ালটা প্রথমে এইটেই বলেছিলো যা রাডি বুঝতে পারে।

'লোকে যে পড়ে যাওয়ার কথা বলে, তা একদম ফাঁকা। ভয় না পেলে কেউ পড়ে না। এসেই দেখ; তোমার একটা থাবা এইভাবে আর এক থাবা এইভাবে রাখো। তোমার সামনের থাবা দুটো দিয়ে পথ অনুভব করো। মাথায় তোমার চোখ আর হাল্কা চট্‌পটে থাবা থাকা চাই। যদি গর্ত থাকে, তাহলে লাফিয়ে পার হয়ে শক্ত করে ধরো, যেমন আমি করি।'

রাডিও তাই করতো; তাকে হামেশাই চালের মটকায় বেড়ালটার পাশে বসে থাকতে দেখা যেতো। অন্যসময় তাকে বসে থাকতে দেখা যেতো গাছের মাথায়, এমন কী জানলার গরাদের ওপর যেখানে পুষিটা যেতে পারতো না।

সে ছোটো হলেও একজন পর্যটক ছিল। অতোটুকু ছোট্ট মানুষটির পক্ষে সে কম ভ্রমণ করেনি। তার জন্ম হয়, ওয়ালিস অঞ্চলে; সেখান থেকে তাকে পাহাড়ের উপর দিয়ে কোলে করে আনা হয়, তার বর্তমানের বাড়িতে। সে বিশাল গ্রিন্‌ডেন্‌ওয়ালড্‌ তুষার-

স্রোতেও গিয়েছিলো। কিন্তু সে কাহিনীটি ছিলো করুণ।

তার মা মারা যান সেখানে। দাদু বলেন, 'খুদে রাডিও তার শিশুসুলভ হাসি-খুশি হারায় সেখানে। তার বয়স তখন এক বছরও হয়নি, তার মা লিখেছিলেন, সে যত কাঁদে, হাসে তার চেয়ে বেশি। কিন্তু যখন থেকে বরফের ফাটলে বসে থাকে তখন থেকে আর এক অশরীরী তার ওপর ভর করে।' তার দাদু কদাচিৎ সে কাহিনী বলতেন, কিন্তু সেই পাহাড়-অঞ্চলের লোকে সে কাহিনী জানতো।

রাডির বাবা ছিলেন একজন ঘোড়-সওয়ার পথ-প্রদর্শক। যে প্রকাণ্ড কুকুরটা তার দাদুর ঘরে শুয়ে থাকতো সে তাঁর যাত্রা-পথে ওপরে সিমপ্লন থেকে নিচে জেনিভাহ্রদ পর্যন্ত অনুসরণ করতো। রোন উপত্যকায়, ওয়ালিসখণ্ডে, রাডির বাবার দিকের কয়েকজন আত্মীয় বাস করতো। তার খুড়ো ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর শ্যাময়-শিকারী ও সুখ্যাত পথ-প্রদর্শক।

রাডি যখন এক বছরের তখন সে তার বাবাকে হারায়, তখন তার মা বাচ্চাটিকে নিয়ে বার্নে তাঁর আত্মীয়দের কাছে ফিরে যেতে ব্যাকুল হন। তাঁর বাবা গ্রিন্‌ডেন্‌ওয়ালড্ থেকে কয়েক মাইল তফাতে থাকতেন। তাঁর বাবা ছিলেন, কাট-খোদাইকার, রোজগারও করতেন যথেষ্ট। তাই জুন মাসে ছেলেটিকে কোলে নিয়ে দুজনে শ্যাময়-শিকারীর সঙ্গে জেমি পর্বতের ওপর দিয়ে গ্রিন্‌ডেন্‌ওয়ালডের দিকে রওনা হন।

তাঁরা পথের বেশির ভাগই পার হয়ে, পাহাড়ের উঁচু দাঁড়া দিয়ে তুষার-প্রান্তর অবধি গেছেন, তাঁর বাসভূমি উপত্যকাখানি চোখে পড়ছে, সুপরিচিত কাঠের বাড়িগুলো সবই দেখতে পাচ্ছেন। পার হতে আর বাকী মাত্র একটি বিশাল তুষার-স্রোত। নতুন তুষার পড়ে একটি ফাটলকে ঢেকে দিয়েছে, নিচে জলস্রোত অবধি না পৌঁছলেও তার গভীরতা ছিল ছ'ফুটেরও বেশি।

তরুণী জননী শিশুটিকে কোলে নিয়ে যেতে হোঁচট খান, কিনারায়

পা পিছলে অদৃশ্য হয়ে যান। সাহায্য করার জন্যে সবচেয়ে কাছের বাড়িখানি থেকে দড়ি ও ডাণ্ডা আনতে একটি ঘণ্টা কেটে যায়। অনেক কষ্টে সেই তুষারভরা ফাটল থেকে যা তোলা হয় তা মৃতদেহ।

সব রকম চেষ্টা করা হয়। বাচ্চাটিকে, বাঁচানো যায় কিন্তু মাকে বাঁচানো যায় না। এইভাবে বৃদ্ধ মাতামহের ঘরে আসে একটি মেয়ের ছেলে, এক অনাথ, যে ছেলে কান্নার চেয়ে হাসতো বেশি। বোধহয় তার মধ্যে মস্ত এক পরিবর্তন হয়েছে, যে পরিবর্তন ঘটেছে তুষার ফাটলে, ঠাণ্ডায় বিচিত্র বরফে। সুইস চাষীদের ধারণা, যারা মন্দ তাদের আত্মা শেষ পর্যন্ত এখানে বন্দী থাকে।

তুষার-স্রোত হচ্ছে কঠিন বরফে পরিণত ফেনিল জলস্রোত। যেন চাপে কতকগুলো সবুজ চাঙড় হয়ে, একটার ওপর আর একটা এমনিভাবে প্রকাণ্ড স্তূপের মতো লম্বা হয়ে পড়ে থাকে। তার তলা দিয়ে প্রচণ্ড বেগে ও শব্দে গলা বরফ ও তুষার নেমে যায় নিচে উপত্যকায় মস্ত মস্ত খাদ ও ফাটলে। এটা এক আশ্চর্য কাচের প্রাসাদ; তার মধ্যে বাস করে তুষার-কুমারী, তুষার-স্রোতের রানী। সে হচ্ছে, সংহারকারিণী, সর্বধ্বংসী, কতকটা হাওয়ার কন্যা, কতকটা শক্তিময়ী নদীর অধিশ্বরী।

সে বলে, 'আমার শক্তি হচ্ছে ধ্বংস করা, আটকে রাখা। ওরা একটিসুন্দরছেলেকে আমার কাছ থেকে চুরি করেছে—যে ছেলেটিকে আমি চুমো দিয়েছি। কিন্তু চুমো দিয়ে তার মৃত্যু ঘটাইনি। সে আবার মানুষের মধ্যে রয়েছে। সে পাহাড়ে পাহাড়ে ছাগল চরায়, ওপর দিকে, আরও ওপরদিকে উঠে যায়, উঠে যায় আর সকলের কাছ থেকে বহু—বহুদূরে, কিন্তু আমার কাছ থেকে দূরে নয়। সে আমার, আমি তাকে নেবই।' রাত্তির ওপর ভর করতে সে মাথা-ঘোরার অপদেবতাকে আদেশ দেয়।

মাথা-ঘোরার অপদেবতাকে বলে, 'তোমার কথা মানছি, কিন্তু ওকে ধরা আমার সাধ্যের অতীত। হতভাগা বেড়ালটা ওকে তার

কায়দা-কৌশল শিখিয়ে দিয়েছে। ঐ ছেলেটার বিশেষ এক শক্তি আছে যা আমাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। ও যখন ডাল ধরে গভীর গহ্বরে ঝোলে তখন আমি ওকে ধরতে পারি না। ওর পায়ের তালুতে শুড়শুড়ি দিতে বা ওর পা দুখানা ওপরে, মাথা নিচের দিক করে শূন্যে ছুঁড়ে দিতে পারলে আমার কত আনন্দ হতো! কিন্তু পারি না যে!'

তুষার-কুমারী বলে, 'যেভাবে হোক, আমরা তা করবো। তুমি বা আমি—আমিই করবো—আমি!'

পাহাড়ে পাহাড়ে গীর্জার ঘণ্টার ধ্বনির প্রতিধ্বনির মতো তার চারধারে একটি কণ্ঠস্বর বলে ওঠে, 'না, না।'

কিন্তু সেটি একটি সংগীত। প্রকৃতির অন্যান্য অশরীরীদের গলে যাওয়া মিলিত সুর—সূর্যালোকের কল্যাণময়ী, স্নেহময়ী কন্যাদের স্বর।

তারা বলে, 'তোমরা তাকে ধরবে না—তোমরা তাকে পাবে না।—'

তুষার-কুমারী বলে, 'ওর চেয়ে বড়ো, ওর চেয়েও শক্তিশালীকে আমি ধরেছি।'

দুই

নতুন বাড়িতে যাত্রা

রাডি এখন আট বছরেরটি। তার কাকা থাকেন পাহাড়গুলোর ওপারে রোন উপত্যকায়। তিনি চান, ছেলেটি তাঁর কাছে এসে কিছু একটা শিখে নিয়ে সংসারের পথ ধরুক। তার মাতামহ দেখলেন, এটা ঠিক। তাই ছেলেটিকে ছেড়ে দিলেন।

তাই রাডি তার দাদুর কাছ থেকে বিদায় নিলে। তা দাদু ছাড়াও আরও ছিলো, যাদের কাছ থেকে তাকে বিদায় নিতে হলো এবং সকলের আগে এলো, আজোলা, সেই বুড়ো কুকুরটা।

আজোঁলা বলে, 'তোমার বাবা ছিল ঘোড়সওয়ার পথ-প্রদর্শক,

আর আমি ছিলাম পথ-প্রদর্শক কুকুর। আমরা একসঙ্গে চলা-ফেরা করতাম। পাহাড়ের ওধারে কোনো কোনো কুকুরকে, কোনো কোনো লোককেও জানি। আমি কখনো কথাবার্তা কইতাম না ; কিন্তু এখন, খুব সম্ভব আর একসঙ্গে কথা কইতে পারবো না, তাই সাধারণত যা বলি, তার চেয়ে একটু বেশি কথা কইবো।

'একটা গল্প বলবো, যা নিজমনেই চেপে রেখেছি, আর অনেক দিন ভেবেছি। আমি সেটা বুঝি না, তুমিও বুঝবে না ; কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। অন্তত এইটুকু ধরতে পেরেছি যে, পৃথিবীতে কুকুর বা মানুষের পক্ষে সমান ভাগে কিছু ভাগ করা নেই।

'সকলেই কোনো মহিলার কোলে দুধ খেতে বসে থাকে না ; আমি এতে অভ্যস্ত হইনি ; কিন্তু আমি ঐ খুদে কোল-কুকুগুলোর একটাকে গাড়ি চড়ে যাত্রীর আসনে বসে যেতে দেখেছি, সেই মহিলাটি তার মনিবের কাছে রাখা দুধের একটা ছোট বোতল থেকে তিনি কুকুরটাকে দুধ খাওয়ালেন। তিনি তাকে মিষ্টি খেতে দিলেন ; কিন্তু সে মিষ্টিগুলো কেবল শুঁকলো, মুখেই দিলে না ; তখন তিনি নিজেই সেগুলো খেয়ে ফেললেন।

'আমি গাড়ির পাশে পাশে কাদা ভেঙে ছুটছিলাম, ক্ষুধার্ত হয়ে। মানে, কুকুর যতোটা ক্ষুধার্ত হতে পারে। আর মনে মনে ভাবছিলাম যে, এটা আদৌ ঠিক হতে পারে না। তুমি কী কোনো মহিলার কোলে বসে গাড়ি চড়ে যাওয়াটা পছন্দ কর? যদি তা করতে তাহলে খুশি হতাম। কিন্তু কেউ নিজের থেকে তা করে উঠতে পারে না। আমি ডেকে বা চিৎকার করে তা করে উঠতে পারিনি।'

এইসব ছিলো, আজোলার কথা। রাডি তাকে জড়িয়ে ধরে তার ভিজে নাকে প্রাণ ঢেলে চুমো দেয় ; তারপর সে বেড়ালটাকে কোলে নেয় ; কিন্তু হুলোটা ছটফট করতে করতে বললে, 'আমার চেয়ে তোমার গায়ে জোর বেশি ; আমি তোমাকে থাবা দিয়ে আঁচড়াতে চাই না। এখন পাহাড়ের ওপর দিয়ে উঠে চলে যাও। কারণ, আমি

তোমাকে পাহাড়ে উঠতে শিখিয়েছি। পড়ে যেতে পারো এটা ভেবো না ; তাহলেই তুমি শক্ত করে ধরে রাখা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারবে।

এই বলে বেড়ালটা ছুটে পালায় ; তার চোখের জল সে দেখতে চায় না।

ছাগলগুলোর কাছ থেকেও সে বিদায় নেয় ; তারা বলে 'ম্যা-ম্যা' এবং তার সঙ্গে যেতে চায়। তাতে তার দুঃখ হয়।

কাছাকাছির যে দুজন সাহসী পথ-প্রদর্শক পাহাড়গুলো পার হয়ে জেমির ওধারে যাচ্ছিল তারা তাকে সঙ্গে নিলে। সে তাদের পিছে চললো পায়ে হেঁটে। একটা ছোটো ছেলের পক্ষে সেই পথটা ছিলো কঠিন। কিন্তু রাডি ছেলেটি ছিলো শক্ত, এবং সে সাহস হারায় না।

পথটা ছিলো ফেনিল, লুৎচাইনের ওপর দিয়ে। জলধারাটি ছোটো ছোটো স্রোতস্বতীর মতো কালো গ্রিনডেল তুষার-স্রোতের ফাটল থেকে ছুটে আসছে। তার ওপর সাঁকোর কাজ করছে, ভেঙে-পড়া গাছের গুঁড়ি ও পাথরের চাঙড়। তারা উল্টো দিকের বনে পৌঁছে ঢালু বেয়ে ওপর দিকে উঠতে আরম্ভ করলো। সেখানে তুষার-স্রোতটা পাহাড় থেকে হড়কে সরে গেছে। এখন তারা তুষার-স্রোতটার বুকে বরফের চাঙড়ের উপর দিয়ে এবং চারধার ঘুরে পার হতে থাকে।

তুষার-স্রোতটা খাড়া পাহাড়ে হ্রদ, স্তূপীকৃত বরফের চাপে প্রবল নদী-ধারার মতো ওপর দিকে প্রসারিত হয়েছে। রাডি ক্ষণিকের জন্যে ভাবলে সেই কাহিনীটি যেটি তাকে একবার বলা হয়েছিলো যে, সে ও তার মা কেমন ভাবে ঐ গভীর, হিম-শীতল ফাটলগুলোর একটার ভেতর শুয়েছিলো। কিন্তু অচিরেই ঐ ধরনের চিন্তা তার মন থেকে মিলিয়ে যায় ; যে সব কাহিনী সে শুনেছিলো, সেটিকেও সেগুলির মতো বোধ হয়।

রাডি কখন এতো উঁচুতে ওঠেনি ; কখন এমন বিস্তীর্ণ তুষার-সমুদ্রে হাঁটেনি। এখানে এটা পড়ে আছে স্থির তুষার-তরঙ্গ বুকে নিয়ে ; যা থেকে বাতাস সমুদ্রের ঢেউয়ের ফেনা যেমন করে উড়িয়ে নিয়ে যায়,

এখানেও তেমনি করে মাঝে মাঝে ফেনা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঠিকমতো বলতে গেলে, তুষার-স্রোতগুলো এখানে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকটা যেন তুষার-কুমারীর এক একটি কাচের প্রাসাদ—যার ইচ্ছা হচ্ছে, ধরেই কবর দেওয়া।

সেই সমস্ত পথচলার স্মৃতি—উঁচু পাহাড়-চূড়ায় রাতের মতো আস্তানা গাড়া, সন্ধ্যার পরও হাঁটা, গভীর, পাষাণ গহ্বর, যেখানে শতাব্দীর পর শতাব্দীর শ্রমে জলধারা কঠিন পাথরকে ভেদ করে গেছে—এইসব রাডির মনে শক্ত হয়ে গেঁথে থাকে।

তুষার-সমুদ্র পারে একখানি পরিত্যক্ত পাথরের বাড়ি তাদের রাতে অশ্রয় দেয়। সেখানে তারা পায় জ্বালানী ও পাইনের ডাল। তৎক্ষণাৎ আগুন জ্বালা হয় এবং যতটা সম্ভবআরামদায়ক করা যায়, সেই মতো রাতের জন্যে বিছানা পাতা হয়। মানুষ কয়টি আগুনের চারধারে বসে, পাইপ টানে এবং নিজেদের জন্যে যে তৃপ্ত পানীয় তৈরি করেছিলো তা খায়।

রাডিও তার ভাগের খাবার পায়। তারপর লোকগুলো আলপ্‌স্ প্রদেশের অদ্ভুত কাহিনীগুলো বলতে শুরু করে; রাডি মন দিয়ে সব শোনে। সবশেষে লোকগুলোর মনে পড়লো, রাডি ছোটো ছেলে, তাই তাকে বলে, সে ঘুমোতে পারে। রাড়িও ক্লান্তিকর পথ-চলায় ক্লান্ত হওয়ায় বাধ্য সৈনিকের মতো তৎক্ষণাৎ শুয়ে পড়ে।…

পরদিন খুব ভোরে তারা আবার চলা শুরু করলো। সেদিন রাডির চোখে পড়ে নতুন পাহাড়মালা ও নতুন তুষার-স্রোতের আর নতুন তুষার প্রান্তরের ওপর সূর্যের আলো ঝক্‌ঝক্ করছে। তারা তখন ওয়ালিস্ অঞ্চলে প্রবেশ করেছে এবং গ্রিনডেল, ওয়াম্বড় থেকে পাহাড়ের যে দাঁড়াটা চোখে পড়ে সেটা পার হয়ে চলেছে।

তারপর অন্য মনোমুগ্ধকর দৃশ্য চোখে পড়ে। বহু নতুন উপত্যকা, বহু বনানী ও পাহাড়ী পথ; এবং সেই সঙ্গে নতুন সব ঘর-বাড়ি ও অপরিচিত মানুষ-জন। অদ্ভুত, অপরিচিত মুখগুলো খুদে রাডির মনে

জাগিয়ে দেয় অনেক ভাবনা এবং পথচলা যতো শেষ হয়, সে ভাবতে শুরু করে তার নতুন বাড়িতে সে কী ধরনের মানুষদের দেখতে পাবে।

তিন

কাকা

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! রাডির কাকার বাড়ি যেখানে এখন তাকে থাকতে হবে, সেখানকার মানুষগুলিকে সে যাদের দেখতে অভ্যস্ত ছিল, তাদেরই মতো দেখতে। তার কাকা তখনও ছিলেন লম্বা-চওড়া শিকারী পুরুষ; তার ওপর বালতি তৈরি করার কৌশলটা বুঝতেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন, ছোটো-খাটো চটপটে মহিলা, মুখখানি পাখির মতো। তাঁর চোখ দুটি ঈগলের মতো তীক্ষ্ণ, গলা লম্বা চুলে ঢাকা।

রাডির কাছে এখনকার প্রত্যেকটি জিনিস নতুন—পোশাক, চাল-চলন ও আচার-ব্যবহার, এমন কী ভাষাও। কিন্তু ভাষাটা রাডির কানে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। তার দাদামশায়ের তুলনায় এখানে স্বচ্ছলতার প্রকাশ ছিলো। ঘরগুলো ছিল আরও বড়ো, দেয়ালগুলোতে টাঙানো ছিলো শ্যাময়-হরিণের বহু শিং, সেগুলোর মধ্যে ছিল ঝক্‌ঝকে রাইফেল। দরজার ওপর ছিলো ম্যাডোনার ছবি, তার সামনে ছিলো আল্‌প্‌সের তাজা পাহাড়ী গোলাপ ও একটি জ্বলন্ত প্রদীপ।

কাকাটি ছিলেন, সে অঞ্চলের সর্বোৎকৃষ্ট শ্যাময়-শিকারীদের একজন ও অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য পথ-প্রদর্শক। এই সংসারে রাডি এখন হলো আদুরে খোকা। কাকা বলেন, 'ওয়ালিস্‌ অঞ্চলের জীবন-যাত্রা খারাপ নয়। আমাদের এ অঞ্চলে শ্যাময়-হরিণ আছে। ওরা স্টেনবকদের মতো অতো সহজে মরে না। লোকে সেকালের সম্মানে যা খুশি তা বলতে পারে, কিন্তু আমাদের কালটা আগের চেয়ে ভালো।

জঙ্গলটা কেটে দেওয়া হয়েছে। উপত্যকা দিয়ে নির্মল খোলা বাতাস বয়ে যায়। পুরনোটা জীর্ণ হয়ে গেলে সর্বদা আগের চেয়ে ভালো কিছু এসে থাকে।'

কাকার যখন কথা কইবার মেজাজ থাকে, তখন তিনি বলেন তাঁর যৌবনকালের এবং তারও আগেকার তাঁর বাবার সময়কার কঠিন অবস্থার কথা ; তখন ওয়ালিস ছিলো এক বদ্ধজলা, অসুস্থ লোকজন ও শোচনীয় বাড়ি-ঘরে ভরা।

তিনি বলেন, 'কিন্তু ফরাসী সৈনিকেরা আসে। আর তারাই ছিলো যোগ্য চিকিৎসক। কারণ, তারা তৎক্ষণাৎ রোগীটিকে মেরে ফেলে ; সেই সঙ্গে মেরে ফেলে যাদের রোগটা ছিলো তাদেরও। তারা লড়াই সম্বন্ধে সবকিছু জানতো। তারা বহু রকমে লড়াই করতে পারতো। তাদের মেয়েরাও যুদ্ধ জয় করেছিলো।'

এই বলে তিনি তাঁর স্ত্রীর দিকে মাথা নুইয়ে হেসে উঠেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন ফরাসী।

রাডি সেই প্রথম তাঁদের বলতে শুনলো, ফ্রান্স ও রোন নদীর তীরে মস্ত শহর লাইনসের কথা, তার কাকা সেখানে ছিলেন।

একজন সুদক্ষ শ্যাময়-শিকারী হয়ে উঠতে রাডির বেশিদিন লাগবে না। তার কাকা বলেছেন, তার মধ্যে এ গুণটা আছে। তাকে রাইফেল ধরতে, টিপ করতে ও গুলি চালাতে শেখালেন। শিকারের মরশুমে তিনি তাকে সঙ্গে করে পাহাড়গুলোর মধ্যে নিয়ে গেলেন এবং তাকে শিকারীর কলা-কৌশল শিখিয়ে দিলেন। বললেন, শ্যাময়গুলো চালাক—ওরা প্রথমে স্কাউট পাঠায়। কিন্তু শিকারীকে আরও চালাক হতে হবে, যাতে গন্ধ না পায়। সেজন্য সাবধান হওয়া দরকার ; ওদের ভোলাতে হবে।

একদিন রাডি যখন তার কাকার সঙ্গে শিকারে বার হলো, তার কাকা একটা গাছের ভাঙা গুঁড়িতে তাঁর কোট ও টুপি ঝুলিয়ে রাখলেন।

শ্যাময়টা কোটকে মনে করলো, মানুষ।

পাহাড়ী পথটা ছিলো সরু, ঠিক মতো বলতে গেলে, সেটা কোন পথই ছিলো না, ছিলো একটা গভীর 'খাদের' ধারের সরু আলসে। এখানে যে তুষার ছিল তা আধ-গলা ; পায়ের চাপে পাথর মড়্‌মড়্‌ করে ভেঙে যাচ্ছিল। সেজন্যে খুড়োমশাই শুয়ে পড়ে বুকে হেঁটে সামনের দিকে এগোতে থাকেন। পাথর ভেঙে যেসব টুকরো বেরিয়ে আসছিলো সেগুলির প্রত্যেকটি পাথরের এক কানা থেকে আর এক কানায় লাফিয়ে ও গড়িয়ে পড়তে নিচের অন্ধকারে অদৃশ্য হচ্ছিল।

রাডি দাঁড়িয়ে ছিলো তার কাকার পিছনে প্রায় একশ' ধাপ পিছনে একটা মজবুত পাথরের ওপর। সেখান সে দেখলো শূন্যে একটা প্রকাণ্ড ভেড়ার বাচ্চা-ধরা শকুন তার কাকার ওপর ঘুরপাক দিচ্ছে। পরিষ্কার বোঝা গেলো, তার মতলব কাকাকে ডানার এক ঝাপটায় খাদে ফেলে দিয়ে তাঁর মাংস খাবে।

তার কাকার সমস্ত নজর ছিলো, যে শ্যাময়টাকে তার বাচ্চা সমেত ফাটলটার ওধারে দেখতে পাওয়া যাবে তার দিকে। রাডি স্থির দৃষ্টিতে পাখিটার দিকে তাকিয়ে রইলো। সে জানতো, পাখিটা কী করবার মতলব করেছে। তাই তাকে গুলি করবার জন্যে রাইফেল উঁচিয়ে রইলো।

শ্যাময়টা হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠলো ; কাকা গুলি করলেন, সেই মারাত্মক গুলিবিদ্ধ হয়ে শ্যাময়টা পড়ে গেলো। কিন্তু বাচ্চাটা লাফ দিয়ে এমনভাবে পালিয়ে গেলো যেন সে বিপদকে এড়িয়ে যেতে সারাজীবন অভ্যস্ত।

রাইফেলের শব্দে ভয়ে চমকে উঠে প্রকাণ্ড পাখিটা আর একদিকে উড়ে চলে গেলো। রাডি তাঁকে না জানানো পর্যন্ত কাকা যে বিপদে পড়েছিলেন তার কিছুই তিনি জানতে পারেন না।

তাঁরা খুব স্ফূর্তির সঙ্গে বাড়ির দিকে ফিরে চলেছেন, কাকা তাঁর যৌবনকালের একটি গান শিস দিয়ে গাইছেন, এমন সময় হঠাৎ

তাঁদের কাছ থেকে অদূরে এক অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেলেন। তাঁরা চারধারে তাকিয়ে দেখলেন। আরে! ঐ যে, পাহাড়ের দিকে তুষারের আস্তরণটা হঠাৎ উঠলো এবং কোনো মাঠে যদি একখানা কাপড় বিছানো থাকে তার তলা দিয়ে বাতাস বয়ে গেলে যেমন হয় তুষারআস্তরণখানিও তেমনি ফুলছে ও চোপসাচ্ছে। মর্মর-পাথরের চাঙড়ার মতো তুষার-তরঙ্গগুলো মসৃণ ও শক্ত ছিল তা এখন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল এবং বজ্রধ্বনির মতো জলধারার শব্দ শোনা যেতে লাগলো। একটা তুষার-চাপ ভেঙে পড়ছিল। রাড়ি ও তার কাকার ওপর নয়, কিন্তু যেখানে তারা দাঁড়িয়েছিলেন, তার কাছেই, তবে বেশি দূরে নয়।

কাকা চিৎকার করে উঠলেন, 'শক্ত করে চেপে ধর রাডি :: গায়ের সব জোর দিয়ে চেপে ধর।'

রাডি সবচেয়ে কাছের গাছটার গুঁড়ি চেপে ধরলো। কাকা তাঁর ওপর দিকে উঠে পড়লেন আর বরফের বিরাট চাপটা তাঁদের কাছ থেকে বহু ধাপ তফাৎ দিয়ে গড়িয়ে চলে গেলো। কিন্তু বাতাসের ঝাপটা, বরফ-চাপের ডানাগুলো, পল্‌কা নলখাগড়ার মতো তাদের চারধারে গাছপালা ও ঝোপ-জঙ্গল সব ভেঙে টুকরোগুলো সোজা নিচে ছড়িয়ে ফেললে।

রাডি মাটিতে জড়সড় হয়ে পড়ে রইলো। যে গুঁড়িটা সে আঁকড়ে ধরেছিলো সেটা মাঝামাঝি ভেঙে গেলো আর তার আগা ছিট্‌কে পড়লো তফাতে। আর সেখানে ভাঙা ডালগুলোর মধ্যে পড়ে রইলেন তার কাকা।

তাঁর মাথাটি গেছে গুঁড়িয়ে। তাঁর হাত তখনও গরম, কিন্তু মুখখানি চেনা যায় না।

রাডি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলো, তার মুখ হয়ে গেছে ফ্যাকাশে। তার জীবনে এই প্রথম আতঙ্ক—সেই প্রথম সে অনুভব করলো তার মাঝ দিয়ে শিহরণ বয়ে গেলো।

অনেক রাত্রে সে সেই দুঃখের খবর বাড়িতে বয়ে নিয়ে এলো। এখন সেটা হলো শোকের বাড়ি। কাকীমা কোনো কথা খুঁজে পেলেন না, দুঃখে চোখে এক ফোঁটা জলও এলো না; অবশেষে মৃতদেহটি বাড়ি আনা হলে তাঁর শোকের বাঁধ ভেঙে গেলো।

এখন রাডির কাজ হলো তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া ও শান্ত করা। পরিশেষে তাঁর শোক কিছুটা কমলে তিনি রাডির দিকে ফিরে বললেন, 'এখন তুই-ই এ সংসারের ভরসা।'

এবং সত্যই রাডি সেই বাড়ির ভরসা হয়ে দাঁড়ালো।

চার

বাবেতি

ওয়ালিস অঞ্চলে কে যে রাইফেলের সবচেয়ে ভালো টিপ্ করে শ্যাময়গুলোর তা বেশ ভালো জানা আছে এবং তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, 'রাডির কাছ থেকে হুঁশিয়ার।'

'সবচেয়ে সুন্দর লক্ষ্যভেদকারী কে?' মেয়েরা বলে, 'কেন, রাডি।' কিন্তু তারা ঐ সঙ্গে যোগ করে না, 'ওর কাছ থেকে সাবধান।'

সে কেমন চট্পটে ও স্ফূর্তিবাজ! তার গাল দুখানি বাদামী হয়েছে, তার দাঁতগুলো সমান ও সাদা; তার চোখ দুটি কালো ও উজ্জ্বল। সে সুপুরুষ তরুণ, এর বয়স মাত্র বিশ বৎসর। সে যখন সাঁতার কাটে তখন বরফগলা জল তার ক্ষতি করতে পারে না। সে জলে মাছের মতো পাক খায়, মোচড় দেয় এবং পাহাড় অঞ্চলে যে-কোনো লোকের চেয়ে পাহাড়ে চড়ে ভালো; সে পাহাড়ের কানায় শামুকের মতো আটকে থাকতে পারে ··আর লাফ-ঝাঁপে সে একটা কৌশল দেখায়, যেটা সে প্রথমে শিখেছে বেড়ালের কাছ থেকে, পরে শিখেছে ছাগলের কাছে।

রাডি ছিল সবচেয়ে সতর্ক পদ-প্রদর্শক। তার সঙ্গে পথ চলতে যে-কেউ নিজেকে নিরাপদ মনে করতো। এই বৃত্তিতে সে বিস্তর ধন-সম্পদও উপার্জন করতে পারতো। তার কাকা তাকে বালতি তৈরির কায়দাগুলি শিখিয়েছিলেন। কিন্তু সে সেকাজ করে না, শ্যাময় শিকারই পছন্দ করে। তাতেও তার টাকা হতো।

রাডিকে সুপাত্র বলা যেতে পারতো যদি না তার নজর থাকতো তার চেয়ে উঁচু সামাজিক মর্যাদার দিকে। সে এমন নাচতো যে, মেয়েরা তার স্বপ্ন দেখতো। বাস্তবিকই অনেকেই তার কথা ভাবতো।

বেক্‌সের কাছে নিচের উপত্যকায় মস্ত মস্ত ওয়ালনাট গাছগুলোর মধ্যে একটি মুখর পাহাড়ী নদীর ধারে বাস করতেন ধনী মিল-মালিকটি। তাঁর বসত বাড়িখানি ছিল মস্ত ও তে-তলা। তাতে ছিলো ছোটো ছোটো টাওয়ার। তার ছাদটা ছিলো তক্তা ও ধাতুর পাত দিয়ে তৈরি। সেগুলো রোদে ও জ্যোৎস্নায় ঝক্‌ঝক্ করতো।

মিলটিকে দেখাতো সুন্দর ও আরামদায়ক। সেটার ছবি আঁকা ও বর্ণনা করা যেতো সহজেই। কিন্তু মিল-মালিকের মেয়েটির ছবি আঁকা বা বর্ণনা করা যেতো না—অন্তত রাডি তাই বলতো। তবু তার অন্তরে সে মেয়েটির ছবি এঁকেছিলো; সেখানে মেয়েটির চোখ দুটি এমন উজ্জ্বল হয়ে ফুটে থাকতো যে, মনে হতো তাতে আগুন জ্বলছে।

এটা প্রকাশিত হয় হঠাৎ। তার, সবচেয়ে আশ্চর্যের যে, মিল-মালিকের মেয়ে, সুন্দরী বাবেতির ধারণাই ছিলো না যে, সে একটা কিছু জয় করে ফেলেছে। কারণ, সে ও রাডি কেউ কারো সঙ্গে কখনও একটি কথাও বলেনি।

মিল-মালিকটি ছিলেন খুব ধনী। তাঁর ধন-দৌলত বাবেতিকে পাওয়া খুব কঠিন করেছিলো, যেন সে একটা গাছে অনেক উঁচুতে আছে। কিন্তু কেউ যদি ওপরে উঠে যায়, তাহলে তার কাছে এমন কিছুই এতো ওপরে নয় যাতে তার নাগাল পাওয়া যাবে না; আর যদি সে পড়ে যাওয়ার ভয় না করে তাহলে পড়বেও না।

এখনো হলো কী, একবার বেক্‌সে রাডির একটা কাজ পড়লো। সেখানে যেতে হলে বিস্তর পথ পার হতে হতো, কারণ, সেকালে তার তখনও রেলপথ পাতা সম্পূর্ণ হয়নি। পথ ছিলো পাহাড়-পর্বত-সংকুল, মাঝে ছিল প্রবল রোন-নদীর স্রোত। সে স্রোত হামেশাই তটভূমি ভাসিয়ে খেত-খামার নষ্ট করে দিতো, ভাসিয়ে দিতো রাজপথ।

বেক্‌স হচ্ছে ওয়াদৎ অঞ্চলের প্রথম শহর। প্রতিপদে উর্বরতা ও প্রাচুর্যের চিহ্ন। পর্যটকের মনে হয় সে যেন ওয়ালনাট ও চেস্‌ট্‌নাট বাগানের মধ্য দিয়ে চলেছে। এখানে-সেখানে সাইপ্রেস উঁকি-ঝুকি দেয়, দেখা যায়, ফুলে ভরা ডালিম গাছ। আবহাওয়ায় দক্ষিণ ইটালীর উগ্রতা।

রাডি বেক্‌সে পৌঁছে তার কাজ শেষ করে শহরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। কিন্তু সে মিলের কোনো ছোকরাকে, এমন কি বাবেত্তিকেও দেখতে পেলো না।···

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিলো। বাবেত্তির দেখা পাওয়া সম্বন্ধে সে হতাশ হয়ে পড়তে লাগলো। এমন সময়ে তার মনে একটা চিন্তা ঘুরপাক দিতে লাগলো।

সে বলে উঠলো, 'ঘাবড়িও না। মিলে দেখা করতে চলো। মিল-মালিককে বলো 'সু-সন্ধ্যা' আর বাবেত্তিকেও বলো 'সু-সন্ধ্যা।' যে পড়বার ভয় করে না, সে কখনো পড়ে না। বাবেত্তি শীঘ্র বা পরে আমার সঙ্গে নিশ্চিত দেখা করবে, যদি আমাকেই তার বর হতে হয়।'

হলদে রঙের নদীটা ফেনা তুলে ছুটে চলেছে ; তার ছুটন্ত জলের ওপর নুয়ে পড়েছে উইলো ও লেবুগাছগুলো। রাডি পথ ধরে মিল-মালিকের বাড়ির দিকে চললো। কিন্তু যেমন ছেলেদের গানে আছে—

'তাকে স্বাগত জানাবার ছিলো না কেউ,
ছিলো কেবল পোষা বেড়ালটার কাজ মিউ মিউ।'

পোষা বেড়ালটা পৈঠার ওপর দাঁড়িয়েছিলো ; বললে, 'ম্যাও' বলেই পিঠ বাঁকালো।

রাডি তার ডাকে সাড়া দিলে না। সে দরজায় ঘা দিলে। কিন্তু কেউ তা শুনলো না, কেউ দরজা খুললো না।

বেড়ালটা বললে, 'ম্যাও'।

যদি রাডি তখনও ছোটো থাকতো, তাহলে তার ভাষা হয়তো বুঝতো আর জানতে পারতো যে, বেড়ালটা বলছে, 'কেউ বাড়ি নেই।' কিন্তু বয়স্ক মানুষ হওয়ায় সে মিলে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলো, মিল-মালিক গেছে ইণ্টারল্যাকেনে ; বাবেতিও গেছে তার সঙ্গে। সেখানে একটা খুব বড় রাইফেলে লক্ষ্যভেদ প্রতিযোগিতা হবার কথা। সেটা চলবে পুরো এক সপ্তাহ। সমস্ত জারমান অঞ্চল থেকে সেখানে লোকেরা যাবে।

বেচারী রাডি! সে সাক্ষাৎ করার জন্যে বেছে নিয়েছে একটা অপয়া দিন। এখন তাকে বাড়ি ফিরে যেতেই হবে। তাই সে ফিরে চললো। চললো তার আপন উপত্যকা ও বাড়ির পাহাড়গুলোর দিকে সেণ্ট মরিস ও সিওনের ওপর দিয়ে। কিন্তু সে হতাশ হলো না। পরদিন সকালে সূর্য ওঠার আগেই তার স্ফূর্তি জেগে উঠেছিলো।

সে নিজের মনেই বললে, 'বাবেতি ইণ্টারল্যাকেনে! সেটা এখান থেকে অনেক দিনের পথ। যদি কেউ বড় রাস্তা দিয়ে যায়, তাহলে অনেক দূরে ; কিন্তু কেউ যদি পাহাড়গুলোর ওপর দিয়ে ছোটো পথ ধারে, তাহলে ততোদূর নয়। আর, শ্যাময়-শিকারীর পথ সোজাসুজি। আমি ইতিমধ্যেই ওদিকে গেছি। ঐদিকে আমার আগের বাড়ি, যেখানে শৈশবে আমার দাদামশায়ের কাছে থাকতাম। আর, ইণ্টারল্যাকেনে হচ্ছে গুলি-ছোঁড়া প্রতিযোগিতা। আমি ওখানেও উপস্থিত থাকবো, সকলের সেরা বন্দুকধারী হবো। যখন একবার পরিচয় করবো তখন বাবেতির সঙ্গেও হবে।

রবিবারের পোশাক পরা ন্যাপস্যাক পিঠে, কাঁধে বন্দুক ও শিকারের থলে, রাডি সোজা পথ ধরে পাহাড়ে উঠতে লাগলো; তা সত্বেও পথটা ছিলো বেশ লম্বা। কিন্তু গুলি-ছোঁড়া প্রতিযোগিতা সেদিন সবে শুরু

হয়েছিলো এবং চলবে এক সপ্তাহ বা তারও বেশি। আর, ওরা তাকে বলেছে, মিল-মালিক ও তার মেয়ে বাবেতি ইণ্টারল্যাকেনে বন্ধুদের সঙ্গে সমস্ত সময়টা কাটাবে।

তাজা ও স্ফূর্তিভরা মনে সে স্বাস্থ্যকর, হাল্‌কা পাহাড়ী বাতাসে হাঁটতে লাগলো। যে পাহাড়ী পথে সে ছেলেবেলায় অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে খোদাই করা বাড়ি বেচতো—হাঁটতে হাঁটতে তা পার হলো। সেই পাইন গাছগুলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে তার দাদামশায়ে বাড়ি; ও বাড়িতে এখন অন্য লোক বাস করে। ছোটো ছেলেরা তার কাছে ছুটে এল তাদের পণ্য বেচতে; তাদের একজন তাকে দিলে একটা পাহাড়ী গোলাপ। রাডি সেটা শুভ লক্ষণ বলে মনে করলো। সে বাবেতিকে মনে করে ফুলটি কিনলো।

লুচাইনের ছুটি শাখা যেখানে যোগ হয়েছে শীঘ্রই সে সেই ব্রিজটি পার হলো। সেখানে বন হয়েছে ঘন, ওয়ালনাট গছগুলো সুন্দর ছায়া বিছিয়েছে। এখন সে দেখতে পেলো ঢেউ খেলানো নিশানগুলো—লালজমির ওপর শাদা ক্রস্ দেওয়া নিশানগুলো—সুইস ও ডনদের জাতীয় প্রতীক। আর, তার সামনেই পড়ে আছে ইণ্টারল্যাকেন।

রাডির মতে, শহরটির তুলনা নেই; কিন্তু আসলে এটা রবিবারের পোশাকে একটি ছোট সুইন শহর। নানা অঞ্চল থেকে আসা কতো লোকের ভিড়! বিদেশ থেকে জমকালো পোশাকপরা ভদ্র পুরুষ ও মহিলাদের কী অপূর্ব সমাগম। প্রত্যেক লক্ষ্যভেদকারী তার টুপিতে মালার সঙ্গে তার সংখ্যা পরে আছে। গান-বাজনা হচ্ছে, বাজছে ব্যারেল-অরগ্যান ও ছোটো ঢাক, হচ্ছে ঠেলাঠেলি ও গোলমাল।

বাড়িগুলো ও ব্রীজগুলো খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। উড়ছে নিশান ও ব্যানার। থেকে থেকে রাইফেল সানন্দে ফট্ ফট্ করছে। আর রাডির কানে রাইফেলের আওয়াজ মধুরতম সংগীতের মতো বাজছে। আর, সেই ঠেলাঠেলি ও হট্টোগোলের মধ্যে সে বাবেতিকে একদম ভুলে গেল, যার জন্যে সে এসেছে সেখানে।

এখন লক্ষ্যভেদকারী দল লক্ষ্যভেদ করার জন্য লক্ষ্যের কাছে জটলা করতে লাগলো। রাডি তাদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো এবং প্রমাণ করলো সে তাদের সকলের চেয়ে দক্ষ ও ভাগ্যবান। প্রত্যেক বারই তার বুলেট লক্ষ্যের গায়ে কালো ফুটি বিদ্ধ করলো।

দর্শকদের কেউ কেউ জিগ্যেস করলে, 'ঐ বিদেশী, তরুণ লক্ষ্যভেদ-কারী কে হতে পারে? ওয়ালিস-অঞ্চলে যে ধরনের ফরাসী ভাষায় কথাবার্তা বলা হয়, ও সেই ভাষায় কথা বলে।'

অন্যেরা বলে. 'ও জারমান ভাষায় যা বলে তাও বেশ ভাল বোঝা যায়।'

লক্ষ্যভেদকারীদের একজন মন্তব্য করে, 'লোকে বলেছে, ও ছেলেবেলায় গ্রিন্‌ডেল্‌ওয়ালডের কাছাকাছি থাকতো।'

এই বিদেশী তরুণটি ছিল প্রাণশক্তিতে ভরা। তার চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছিল, দৃষ্টি ও বাহু স্থির; আর সেইজন্যেই সে অমন ভালোভাবে লক্ষ্যভেদ করেছে। সমৃদ্ধি সাহস দেয়, কিন্তু রাডির যথেষ্ট নিজস্ব সাহস ছিল।

অল্পকালের মধ্যেই সে একদল বন্ধুর সমাবেশ ঘটালো। তারা তাকে সম্মান দিলে, শ্রদ্ধা জানালে; সেই মুহূর্তে বাবেত্তিকে আর তার মনে রইলো না। তখন হঠাৎ একখানা ভারি হাত তার কাঁধে থাবা দিলে এবং একটা গম্ভীর স্বর তাকে ফরাসী ভাষায় বললে, 'তুমি ওয়ালিস্ অঞ্চল থেকে এসেছো?'

রাডি মুখ ফিরিয়ে দেখে, একখানি লাল ও সহাস্যমুখ; লোকটি মোটা-সোটা। বক্তা হলেন, বেক্‌সের ধনী মিল-মালিক। তাঁর চওড়া শরীরটা সুন্দরী বাবেত্তিকে প্রায় ঢেকে রেখেছিলো। সে উজ্জ্বল দৃষ্টি দিয়ে তাঁর পিছন থেকে উঁকি দিচ্ছিল।

দেশের লোকদের পরস্পরের সঙ্গে বহুদূরে কোথাও যখন দেখা হয়, তখন তারা কথাবার্তা ও আলাপ-পরিচয় করবেই। চমৎকার লক্ষ্যভেদের দৌলতে, লক্ষ্যভেদকারীদের সভায় রাডি হলো প্রথম,

যেমন মিল-মালিকটি বেকৃসে তাঁর স্বদেশে টাকা ও তাঁর ভালো মিলটির জন্যে হয়েছিলেন প্রথম। তাই দুজনে করমর্দন করলেন— যা তাঁরা আগে কখন করেননি।

বাবেতিও রাডির দিকে সরলভাবে হাত বাড়ালো। রাডিও তার মুখের দিকে এমন মন-প্রাণ দিয়ে তাকালো যে, বাবেতির চুলের গোড়া পর্যন্ত রাঙা হয়ে গেলো।

যে দীর্ঘপথ ধরে সেখানে এসেছেন এবং যে সব শহর দেখেছেন, মিল-মালিক সে সবের কথা বললেন।

রাডি মন্তব্য করলে, 'আমি এসেছি সবচেয়ে ছোটো পথ ধরে। এসেছি পাহাড়গুলোর ওপর দিয়ে হেঁটে। মানুষ ডিঙোতে পারে না এমন উঁচু রাস্তা নেই।'

মিল-মালিক সহাস্যে বললেন, 'আর ঘাড়ও ভাঙে। তোমাকে দেখায় তার মতো যে শীগ্‌গিরই নিজের ঘাড় ভাঙবে, তুমি এমন নির্ভীক!'

মিল-মালিক ও বাবেতি ইণ্টারল্যাকেনে তাঁদের যে আত্মীয়ের বাড়িতে ছিলেন, তাঁরা রাডিকে তাঁদের বাড়িতে যেতে আমন্ত্রণ জানালেন। কারণ, সেও তাঁদেরই অঞ্চলবাসী।

রাডি তাঁদের বাড়িতে পরিবারের আপনজনের মতো হয়ে পড়লো। সন্ধ্যার দিকে বেড়াতে বার হলো। পথে বহুলোকের ভিড় ঠেলে তাদের এগোতে হলো। রাডি ও বাবেতি তাই হাত ধরাধরি করে চললো।···

তারা তখনও বেড়াচ্ছে, পাষাণ প্রাচীরের পিছনে সূর্য অস্ত গেলো। প্রত্যেকে দাঁড়িয়ে সেই মহান্ দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলো ; রাডি ও বাবেতির মন খুশিতে ভরে গেলো।

বাবেতি বললে, 'এখানকার চেয়ে সুন্দর আর কোথাও নয়!'

রাডি বলে উঠলো, 'আর কোথাও নয়!' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর বললে, 'কিন্তু আগামীকাল আমাকে বাড়ি ফিরতেই হবে।'

বাবেতি ফিসফিস করে বললে, 'বেক্সে আমাদের বাড়িতে দেখা করতে যেও! আমার বাবা খুশি হবেন।'

পাঁচ

মিলে দেখা-সাক্ষাৎ

পরদিন রূডি যখন পাহাড়গুলোর ওপর দিয়ে বাড়ির দিকে চললো তখন তার কী বোঝা যে বইতে হলো, কী বলবো! তার সঙ্গে তিনটে রূপোর গব্‌লেট, দুটো সুন্দর রাইফেল, একটা রূপোর কফি-বিগ্‌গিন। শেষেরটা কাজে লাগবে যখন সে সংসার পাতবে।

তার বৃদ্ধা কাকীমা বলে উঠলেন, 'তুমি কি সুন্দর সব জিনিস বাড়ি এনেছো। তোমার কপাল ভালো রূডি। সোনার ছেলে! তোমাকে চুমু দিতেই হবে!'

তাঁর অদ্ভুত ঈগল-চোখ দুটো চক্‌চক্ করে উঠলো, আর সরুগলা দুলতে লাগলো। রূডি তাঁকে তার কপলে চুমু দিতে দিলে, কিন্তু মুখ সিঁটকে রইলো।

বৃদ্ধা প্রশংসাভরে বললেন, 'তুমি কতো সুন্দর!'

রূডি সহাস্যে বললে, 'আমার মাথায় বাজে কথা ঢুকিও না।' কিন্তু তা সত্ত্বেও সে কাকীমার কথায় খুশি হলো।

তিনি বলে উঠলেন, 'আমি আবার বলছি, তোমার কপাল ভালো?

সে মন্তব্য করলে, 'হয়তো তোমার কথা ঠিক।' সে বাবেতিকে ভাবতে লাগলো।

সে মনে মনে বললে, 'তারা হয়তো এতোদিনে ফিরেছে।'...

তাই সে গেল বেক্সে। মিলের লোক কয়টি বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। তাকে তাঁরা স্বাগত জানালেন। ইন্টারল্যাকেনবাসীরা তাকে শুভেচ্ছা পাঠিয়েছিল।

বাবেতি বেশি কথা বললে না; সে চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলো;

কিন্তু তার দৃষ্টি অনেক কথা বললে। রাডির কাছে তা অনেক।

মিল-মালিকই বেশিরভাগ কথা বলতে লাগলেন। তিনি আশা করতেন তিনি ধনী, এজন্যে তাঁর শ্রোতারা তাঁর কথায় ও পরিহাসে হাসবে। কিন্তু রাডির মনে হলো, তিনি যেন রাডির শিকার-অভিযান শুনতে শুনতে কখন ক্লান্ত হবেন না।

রাডি পরিষ্কার লক্ষ্য করলো, তার প্রত্যেকটি নতুন শিকার-কাহিনী তাকে বেশি করে মিল-মালিকের প্রিয় করে তুলছে। তরুণ শিকারীটি 'ভেড়ার ছানা শিকারী শকুন' ও রাজ-ঈগল সম্বন্ধে যে সব কথা বললে, তিনি তাতে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হলেন।

নানাকথার মধ্যে সে উল্লেখ করলে, ওয়ালিস্ অঞ্চলে, কাছেই একটা ঝুলে-পড়া খাড়া পাহাড়ের খাঁজে খুব কৌশলে তৈরি একটা ঈগলের বাসা আছে। বাসাটিতে আছে ঈগলের ছানা। তাকে ধরা যায় না। কয়েক দিন আগে একজন ইংরেজ পারেনি। রাডি যদি সেই ঈগল-ছানাটিকে জীবন্ত এনে দিতে পারে তাহলে সে দেবে তাকে একমুঠো স্বর্ণমুদ্রা।

রাডি বললে, 'কিন্তু সব কিছুর একটা উদ্দেশ্য আছে। সেই ঈগলছানাটিকে নেওয়া বারণ। চেষ্টা করাটা হবে দোষের।'

কথাবার্তা চলতে লাগলো। রাডি যখন বাড়ি রওনা হলো, তখন রাত বারোটা বেজে গেছে। তবু তার মনে হলো, সন্ধ্যেটা কতো ছোটো।···

কয়েকদিন পরে রাডি গেল মিল-মালিকের বাড়ি। সে মিল-মালিকের কাছে বাবেত্তিকে বিয়ে করার প্রস্তাব করলে।

বাবেত্তি রাডিকে ভালোবেসেছিল। সে সম্মত থাকলেও মিল-মালিক বললেন, 'বাবেত্তিকে তোমায় দেবো যখন তুমি আমায় ঈগল-ছানাটিকে জীবন্ত এনে দেবে।' বলে তিনি এমন হাসতে লাগলেন যে, শেষে চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। 'কিন্তু তোমার এখানে আসার জন্যে তোমায় ধন্যবাদ দিতেই হবে। বিদায় রাডি।'

বাবেত্তিও তাকে করুণভাবে বললে, 'বিদায়।'

রাডি বলে উঠলো, 'তোমার কথাই একটা চুক্তি। কেঁদো না বাবেত্তি। তোমায় ঈগলের ছানা এনে দেবো।'

মিল-মালিক কিন্তু মনে মনে বলেছিলেন, 'আশা করছি, তোমার প্রথমে ঘাড় ভাঙবে। তার ফলে তোমার এখানে ঘুর ঘুর করা থেকে আমরা রেহাই পাবো। ওটাকেই আমি বলি, প্রচণ্ড লাথি।'

রাডি চলে গেছে, বাবেত্তিও কাঁদছে, মিল-মালিক বসে বসে গাইছেন জার্মান-গান। কিছুদিন আগে ভ্রমণে গিয়ে তিনি শিখে এসেছিলেন এই গানটি।

রান্নাঘরের বেড়লটা বৈঠকখানার বেড়ালটাকে বললে, 'তবু রাডির লাভের কিছু সম্ভবনা আছে।'

ছয়

ঈগলের বাসা

পাহাড়ের পথ থেকে নিচে উঠলো, এক নতুন গান, জোরালো ও আনন্দময়—তাতে প্রকাশ পেতে লাগলো সাহস ও তেজ। গানটির গায়ক রাডি। সে এসেছে, তার বন্ধু ভেসিনৌকে খুঁজতে।

'আমাকে তোমায় সাহায্য করতেই হবে! আমাদের সঙ্গে নাগলিকে নেবো। পাহাড়ের মাথার বাসা থেকে আমি ঈগলের ছানাটাকে পেড়ে নিতে চাই।'

ভেসিনৌ জবাব দিলে, 'প্রথমে চাঁদ থেকে তার কলঙ্কগুলোকে বার করে নিতে চাও, না? ঈগল-ছানাটিকে পেড়ে আনাও ঠিক ঐ রকম সহজ। বোধ হচ্ছে, বেশ খোশ-মজাজে আছো।'

'নিশ্চয়। কারণ, শীগ্‌গিরই বিয়ে করার আশা করছি। কিন্তু হাস্য-পরিহাস ছেড়ে গুরুত্বের সঙ্গে কথাবার্তা বলা যাক। তোমাদের

বলছি ব্যাপারটা কী!'

ভেসিনৌ ও নাগলি শীঘ্র জানতে পারলো, রাডি কী চাইছে।

মাঝরাতে তারা রওনা হলো, কতকগুলো লম্বা ডাণ্ডা, মই ও দড়ি নিয়ে। অন্ধকার রাত। পথটা তাদের নিয়ে চললো বন, ঝোপ-ঝাড় ভেদ করে ও আলগা-গড়ানো পাথরের ওপর দিয়ে ক্রমাগত ওপর দিকে।

তাদের নিচে দিয়ে জলস্রোত ছুটে চলেছে, ওপর থেকে টপ্ টপ্ করে জল চুঁইয়ে পড়ছে, শূন্য দিয়ে ভেসে চলেছে ঘন মেঘ।

শিকারীরা খাড়া পাথরের প্রাচীরের পাশে পৌছলো। এখানে অন্ধকার আরও গাঢ়। গভীর ফাটলটার বিপরীত পাশ দুটি পরস্পরকে প্রায় ছুঁয়ে আছে। তাদের ওপরে মাত্র একটি ছোটো ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখতে পাওয়া যায়। আর, তাদের চারধারে ও নিচে বিশাল খাদ। তার মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে ফেনিল জল।

তিনজনে ভোরের অপেক্ষায় পাথরের ওপর বসে রইলো। ভোরে ঈগলটা উড়ে চলে যাবে। ছানাটাকে ধরবার আগে ধাড়িটাকে গুলি করে মারতেই হবে। সেজন্যে তাদের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো।

এখন তাদের ওপর দিকে একটা শোঁ শোঁ হুড়্ হুড়্ শব্দ শোনা গেল এবং ওপর দিকে উঠে যাওয়া প্রকাণ্ড, একটা কী যেন আকাশ অন্ধকার করে ফেললো। ঈগলটার কালো মূর্তিটা বাসা থেকে উঠতেই একজোড়া বন্দুক তার দিকে তাক করা হলো। তৎক্ষণাৎ গুলি করার আওয়াজ শোনা গেলো। মুহূর্তের জন্যে মেলা ডানা দুটো নড়তে লাগলো এবং তারপরই পাখিটা নামবার সময় ডালপালা ও ঝোপ-ঝাড় ভাঙতে ভাঙতে গভীর গহ্বরে তলিয়ে গেলো।

শিকারীরা এবার কাজ শুরু করলো। সবচেয়ে লম্বা তিনখানা মই একসঙ্গে বাঁধা হলো, যাতে ওপর পর্যন্ত পোঁছয়। তার একটি মাথা রাখা হলো গহ্বরের কিনারে। আর এক মাথা রইলো ওপর দিকে। কিন্তু সে মাথাটা বেশি ওপরে পৌছলো না। তারও ওপরে ফাটলের মধ্যে যেখানে বাসাটা লুকানো ছিল, সেখানকার পাথর ছিল

প্রাচীরের মতো সমান।

তখন অল্পক্ষণ পরামর্শের পর তারা স্থির করলো, দুখানা মই একসঙ্গে বেঁধে ওপর থেকে ঝুলিয়ে নিচের তিনখানা মইয়ের মাথায় বেঁধে দিতে হবে।

অনেক চেষ্টায় মই দুখানা ওপরে টেনে তুলে খুব শক্ত করে বাঁধা হলো। তারপর মইগুলো পাথরটার ওপর এমনভাবে লাগিয়ে দেওয়া হলো যার দরুণ সেগুলো গহ্বরের ওপর ঝুলতে লাগলো। রাডি ততোক্ষণে সবচেয়ে নিচের পারে পা রেখেছিলো। তারপর বিপদের দারুণ ঝুঁকি নিয়ে রাডি নিচের তিনখানা মইয়ের শেষেরটির মাথায় উঠে সেগুলো ওপরের মই দুখানার সঙ্গে বেঁধে দিলে। এবার ঈগলটার বাসার নাগাল পাওয়া গেলো।···

এবার পাঁচখানা মই সেই বিশাল পাষাণ-প্রাচীরের গায়ে খাড়াভাবে লাগানো রইল।···এর পরের কাজটি হলো সবচেয়ে বিপজ্জনক।

বেড়াল যেমন করে ওপরে ওঠে, উঠতে হবে তেমনি করে। কিন্তু রাডি ওপরে উঠতে শিখেছে, আর বেড়ালই তাকে ওপরে উঠতে শিখিয়েছে।

সে উঠতে লাগলো এবং সবচেয়ে উঁচু মইখানার একেবারে শেষধাপে গিয়ে উঠলো। কিন্তু দেখা গেল সেটা বাসাটার মধ্যে ঠাওর করার মতো উঁচু নয়; সে কেবল হাত বাড়িয়ে বাসাটার নাগাল পাচ্ছে।

বাসাটার নিচের অংশে যে ডালগুলো জড়িয়ে পেঁচিয়ে ছিলো হাত দিয়ে অনুভব করলো সেগুলো কতোখানি শক্ত। তার মধ্যে একটা মোটা শক্ত ডাল হাতে পেয়েই সেটা ধরে মই থেকে ঝুলে সেটার ওপর দিয়ে বাসার মধ্যে মাথা বড়িয়ে দিল। আর, পচা মাংসের উৎকট গন্ধ এসে তার নাকে লাগলো।

বাসাটার মধ্যে ছিল পচা-গলা শ্যামম, পাখি ও ভেড়ার ছানা।

এককোণে বসে ছিল মস্ত ছানাটা। তার গায়ে তখনও পালক

গজায়নি। রাডি তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে একহাতে ডালটা গায়ে যতো জোর ছিলো সব দিয়ে চেপে ধরে, অপর হাতে ফাঁসটা ছানাটার ওপর ছুঁড়ে দিলে।

ছানাটা ধরা পড়লো—ধরা পড়লো জীবন্ত।

তার পা-ছুখানা শক্ত ফাঁসে বাঁধা পড়লো। তারপর পাখিশুদ্ধ দড়িটা তার কাঁধের ওপর এমনভাবে ফেললে যাতে পাখিটা তার থেকে খানিকটা নিচে ঝোলে। আর সেই সময়ে পাথরখানার ওপর থেকে তার বন্ধুরা একগাছা দড়ি ঝুলিয়ে দিতেই সে সেটা শক্ত করে চেপে ধরে সবচেয়ে উঁচু মইখানার সবচেয়ে উঁচু পারে পা ঠেকালো।

উঠলো একটা জোরালো আনন্দধ্বনি। রাডি বন্দী পাখিটাকে নিয়ে নিচে স্থির-কঠিন পাথরের ওপর দাঁড়ালো।

সাত

বৈঠকখানার বেড়ালটাকে যে খবর বলতে হলো

বেক্‌সে মিল-মালিকের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে রাডি বললে, 'এই যে, যা চেয়েছিলেন।'

মেঝেয় মস্ত একটা ঝুড়ি রেখে, রাডি তার কাপড়ের ঢাকা তুলে ফেললে। কালো দাগে ঘেরা একজোড়া হলদে চোখ জ্বলজ্বল করতে লাগলো। বোধ হলো সে ছুটো থেকে আগুনের ফুল্‌কি ঠিকরে পড়ছে, ঝক্‌ঝক্ করছে, জ্বলছে, নির্মম, যেন যাদের দিকে তাকাবে তাদের সকলকেই পুড়িয়ে ফেলবে। ছোট শক্ত ঠোঁট খোলা, যেন ছিঁড়ে নিতে প্রস্তুত, লাল গলাটা থলথলে মাংসে ঢাকা।

মিল-মালিক বলে উঠলেন, 'ঈগলের ছানা! তুমি ঘাবড়াবার পাত্র নও!'

রাডি উত্তর দিলে, 'আর আপনি সর্বদা আপনার কথা রাখেন।

প্রত্যেকেরই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য আছে।'

মিল-মালিক জিগ্যেস করলেন, 'তোমার ঘাড় ভাঙলো না কেন?'

রাডি উত্তর দিলে, 'কারণ আমি শক্ত করে চেপে ধরেছিলাম। এখনও তাই করছি। বাবেত্তিকে শক্ত করে ধরে আছি।'

'প্রথমে দেখো তাকে পাও কিনা।' বলে মিল-মালিক হাসলেন।

রাডিকে তার দুঃসাহসিক কাহিনীটি বলতে হলো, শুনতে শুনতে মিল-মালিকের চোখ দুটো ক্রমেই বড় হতে লাগলো। অবশেষে বললেন, 'তোমার সাহস আর সৌভাগ্যের সাহায্যে তিনটি স্ত্রীকে ভরপোষণ করতে পারবে।'

রাডি বললে, 'ধন্যবাদ।'

'তবু তুমি এখনও বাবেত্তিকে পাও নি।' বলে মিল-মালিক তরুণ শিকারীটিকে ঘাড়ে সহাস্যে টোকা মারলেন।

'স্থির হবে, বিয়েটা হবে আগামী গ্রীষ্মে।'

বৈঠকখানার বেড়ালটা বললে, 'ওরা দুটোতে কেমন করে একসঙ্গে বসে থাকতে পারে?···ওদের দুটোর জন্যে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ছি।'

আট

অশুভ শক্তি

রাডি বেক্স থেকে বাড়ির পথ ধরলো। পাহাড়ের ওপর যেখানে বইছিল নির্মল শীতল বাতাস, মাটিতে বিছিয়ে ছিলো সদ্যপড়া তুষার যেখানে তুষার-কুমারী রাজত্ব করতো। সে উঠে গেলো সেখানে।···

আরও ওপরে দেখা গেলো একজোড়া শ্যাময়। তার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, ভাবনা নতুন পথ ধরলো কিন্তু শ্যাময় দুটোর যথেষ্ট কাছে না থাকায় লক্ষ্য সম্বন্ধে সে নিশ্চিত হতে পারলো না, তাই সে উঠে গেলো আরও ওপরে, যেখানে পাথরের বড় বড়

চাঁইগুলোর ফাঁকে সামান্য ঘাস ছাড়া আর কিছু জন্মায় না।

শ্যাময় ছুটো তুষার-প্রান্তরে শান্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে পা চালিয়ে চলতে লাগলো। এক জায়গায় মেঘ তাকে ঢেকে ফেললে। হঠাৎ সে দেখলো, সে এক খাড়া পাহাড়-প্রাচীরের সামনে এসে পড়েছে। তখন ঝিরঝির করে বৃষ্টি নামলো।

তার খুব পিপাসা পেলো, মাথা গরম এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠাণ্ডা হয়ে এলো। সে ফ্লাস্কটা হাতে নিলে, কিন্তু সেটা খালি। যখন পাহাড়ের পথে সে বেরিয়ে পড়ে তখন সেটা ভরে নেবার কথা ভাবেই নি।

সে জীবনে কখনও অসুস্থ হয়নি। কিন্তু এখন অসুস্থ অবস্থার আভাস পেলো। সে ক্লান্ত। চারধারে বৃষ্টি পড়লে তার শুয়ে ঘুমোতে ইচ্ছে হলো।···তার চোখের সামনে সবকিছু নাচতে ও কাঁপতে লাগলো।

তখন সেখানে সে যা আগে কখন দেখেনি, তা দেখতে পেলো। দেখলো, একখানা নিচু চালা নতুন বাড়ি পাহাড়ের গায়ে হেলে আছে। আর, তার দরজায় দাঁড়িয়ে এক তরুণী। তাকে অনেকটা দেখতে স্কুল-মাস্টারের মেয়ে আনেত্তির মতো। মেয়েটির সঙ্গে এক সময়ে তার খুব ভাব ছিলো।

রাডি তাকে জিগ্যেস করলে, 'তুমি কোথা থেকে ?'

জবাব হলো ঃ 'এই আমার বাড়ি। আমার ছাগলের পাল চরাচ্ছি।'

'তোমার ছাগলের পাল ? কোথায় ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে ? এখানে তো কিছুই নেই।'

মেয়েটি সহাস্যে বললে, 'তুমি যেন এখানকার সব জান! আমাদের পিছন দিকে, নিচে সুন্দর চারণ-মাঠ আছে, আমার ছাগলগুলো সেখানে চরে, আমি তাদের যত্নের সঙ্গে পালন করি, একটাকেও হারাই না। যা একবার আমার হয়, তা আমারই থাকে।'

'যদি বাড়িতে একটু দুধ থাকে, দয়া করে আমায় একটু দাও।

আমি খুব তৃষ্ণার্ত।'

মেয়েটি বললে, 'দুধের চেয়েও ভাল কিছু আছে। তোমায় তা দেবো। গতকাল কয়েকজন পর্যটক এখানে এসেছিলো। তারা এক বোতল মদ ভুলে ফেলে গেছে। সম্ভবত এ রকম পানীয় তুমি কখনও খাওনি। তারা এটা নিতে আর ফিরে আসবে না। আর, আমি এখন খাই না। সেজন্যে তুমিই খাবে।'

মেয়েটি পানীয়টি এনে কাঠের পেয়ালায় ঢেলে রাডিকে খেতে দিলে।

রাডি খেয়ে বললে, 'চমৎকার পানীয়! আমি কখনও এমন উত্তেজক পানীয় খাইনি।'

তার চোখ দুটো চক্‌চক্ করতে লাগলো। সে যেন কেমন হয়ে গেল। সে বললে, 'আরে,এ নিশ্চয়আনেতি !আমায় একটা চুমু দাও।'

'তাহলে তোমার আঙুলেযে সুন্দর আংটিটি আছে সেটা আমায় দাও।'

'আমার বিয়ের আংটিটা?'

মেয়েটি বললে, 'হাঁ, ঐটেই।'

সে মেয়েটির দিকে তাকালে—এ আনেতি, তবু আনেতির মতো নয়। এখানকার মেয়েটিকে দেখাচ্ছে, সদ্যপড়া শাদা তুষারের মতো, আল্‌প্‌সের গোলাপের মতো ফুটন্ত, হরিণ-ছানার মতো ক্ষিপ্রচারণা। কিন্তু তবু তাকে রাডির মতোই রক্ত-মাংসের মনে হচ্ছে।

সে মেয়েটির আশ্চর্য চোখ দুটির দিকে তাকালো—তাকালো মাত্র মুহূর্তের জন্যে—কে সেই চোখ দুটি বর্ণনা করবে? সেই মুহূর্তে চোখ দুটি জীবন অথবা তার মধ্যে মৃত্যু তাকে উর্ধ্বে বয়ে নিয়ে যেতে লাগলো কিংবা সে গভীর ও মারাত্মক তুষার-ফাটলের নিচে, আরও নিচে তলিয়ে যেতে লাগলো। সে দেখলো, তুষার-প্রাচীরগুলোকে নীলাভ সবুজ কাচের মতো দেখাচ্ছে, তার চারধারে গভীর গহ্বর হাঁ করে আছে; আর, জল পড়ছে ঝকঝকে ঘণ্টার মতো টুংটাং শব্দে।

বিন্দুগুলো মুক্তার মতো স্বচ্ছ, নিষ্প্রভ অগ্নিশিখার মতো দীপ্যমান।

তুষার-কুমারী তাকে চুম্বন করলো। সে চুম্বনে তার গলা থেকে ভ্রূ অবধি শিহরণ বয়ে গেল। তার মুখ থেকে যন্ত্রণার শব্দ বেরিয়ে এলো। সে উঠে পড়লো, টলতে লাগলো তার চোখের সামনে রাত্রি; সে তখনই আবার চোখ খুললো। অশুভ শক্তি তার সঙ্গে তামাশা করছিল।···

আল্‌প্‌সের সেই মেয়েটি অদৃশ্য হয়েছে; অদৃশ্য হয়েছে সেই আশ্রয় কুঁড়ে ঘরটি; উদ্ভিদহীন পাষাণ প্রাচীরের গা বেয়ে জল ঝরছে, চারধারে তুষার বিছানো।

রাডি ঠাণ্ডায় কাঁপছে। তার সারা শরীর ভিজে গেছে এবং তার আংটিটি নেই—যে আংটিটি বাবেত্তি তাকে দিয়েছিল।

তখন বাবেত্তি মিলে বসে কাঁদছিলো। রাডি সেখানে কতোদিন আসেনি।

নয়

শেষ কথা

রাডি ভাবছে, পর্বত-শিখরে তার কী হয়েছিল? সে যাদের দেখেছিল তারা কী অশরীরী অথবা জ্বরের ঘোরে ভুল স্বপ্ন? সেদিন পর্যন্ত সে কোনো অসুখে ভোগেনি।

সে বাবেত্তির কথা ভাবছে; ভাবছে কতো কথা। সে দেখছে বাবেত্তি তার সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে দুষ্টুমিভরা হাসি।

তারপর তার ও বাবেত্তির জীবনে সবচেয়ে সুখের দিন—বিয়ের দিনটি তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসতে লাগলো। অবশেষে দিনটি স্থির করা হলো। তার আগের দিন সন্ধ্যার দিকে সকলে যাবে ভিলিনুয়েভে।···যাত্রা করতে হবে আগামীকাল। আর তার আগের

দিন সন্ধ্যায় রাডি ও বাবেত্তি বাগ্‌দত্তা দম্পতির মতো একত্রে বসে রইলো।

বাইরে আল্‌প্‌স পর্বত ঝলমল করছে, সান্ধ্য ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে, সূর্যরশ্মির কন্যাগুলি গাইছে, যা সর্বোৎকৃষ্ট তাই ঘটুক।

সন্ধ্যা তখনও হয়নি। তিনটি সুখী মানুষ পৌঁছলো ভিলিন্যুয়েভে। সেখানেই তারা খেয়ে নিলে। মিল মালিক আরাম-চেয়ারে বসে পাইপ টানতে টানতে একটু ঘুমিয়ে পড়লেন। আর বাগদত্ত দম্পতি পাশাপাশি চললো শহরের বাইরে। তারা চললো পথ দিয়ে সবুজে ঢাকা পাহাড়গুলোর তলায় তলায়, নীলাভ-সবুজ হ্রদটির তীর ধরে। তার স্বচ্ছ জলে পড়েছে ম্লান চিলনের ধূসর প্রাচীর ও বড় বড় টাওয়ারের প্রতিবিম্ব। তিন-বাবলাগাছের দ্বীপটি হ্রদের বুকে তাদের আরও কাছে নোজগে ফুলের মতো স্থির হয়ে রয়েছে।

বাবেত্তি বললে, 'ওখানটা নিশ্চয়ই মনোরম!'

সেখানে যেতে তার খুবই ইচ্ছে হলো। কূলে একখানা নৌকো বাঁধা ছিলো। তার দড়ি খোলা অতি সহজ। কাউকেই দেখা পেলো না, যার কাছ থেকে নৌকোখানা ব্যবহারের অনুমতি চাইতে পারে। সুতরাং তারা বিনা বাক্যব্যয়ে নৌকোখানা ধার করে নিয়ে চললো। রাডি সুদক্ষ দাঁড়ি।

দাঁড়গুলো মাছের পাখনার মতো জল কাটতে লাগলো··· নৌকোখানার পিছনে চলার পথে জল ঝলমল করছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই নৌকো তাদের দুজনকে নিয়ে দ্বীপে পৌঁছলে তারা তীরে নামলো।

রাডি বাবেত্তির সঙ্গে দু-তিনবার ঘুরপাক দিয়ে নাচলো। তারপর ঝুঁকেপড়া বাবলাগাছগুলোর তলায় বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে পড়লো এবং পরস্পরের চোখের দিকে তাকালো। অস্তোন্মুখ সূর্যের সোনালী আভায় সবকিছু উজ্জ্বল।

দুজনেই বলে উঠলো, 'এতো সৌন্দর্য! এতো সুখ!'

রাডি বললে, 'এই—এর চেয়ে বেশি আর কিছু দেবার নেই। এই রকমের একটি দিনান্ত যেন সারাজীবনের সবকিছু পূর্ণ করে।'

বাবেত্তি বললে, 'আমার সারা অন্তর সুখে ভরে উঠেছে!'

রাডি বললে,'এই ধরণীর আমাকে আর বেশি কিছু দেবার নেই!'

স্যাভয়ের পর্বতগুলো থেকে সান্ধ্য ঘণ্টাধ্বনি হতে লাগলো।··· পশ্চিমে উঠেছে কালো জুরা পাহাড়শ্রেণী—গলায় সোনার মালা।

বাবেত্তি আস্তে আস্তে বললে, 'যা সবচেয়ে সুখের, সবচেয়ে ভালো, ঈশ্বর তোমাকে তা দান করুন।'

রাডি বললে, 'আগামীকাল তা হবে। আমি কাল তা পাবো। কাল তুমি আমার স্ত্রী হবে।'

হঠাৎ বাবেত্তি বলে উঠলো, 'নৌকোখানা!'

যে ছোট ডিঙিতে তাদের ফিরতে হবে সেটা খুলে দ্বীপ থেকে দূরে ভেসে চলেছে।

রাডি বললে, 'আমি ফিরিয়ে আনবো।'

এবং কোটটা একপাশে ফেলে দিয়ে, বুটজোড়া খুলে সে হ্রদে ঝাঁপিয়ে পড়ে নৌকোখানার দিকে সাঁতরে চললো।

পর্বতের তুষার-স্রোত থেকে এসেছে নীলাভ-সবুজ বরফ জল ঠাণ্ডা ও গভীর। রাডি তার তলার দিকে তাকিয়ে দেখলো একবার মাত্র—তার বোধ হলো সে দেখলো একটা সোনার আংটি ঘুরছে, ঝিলিক দিচ্ছে, ঝকমক করছে। তার মনে পড়লো বাগদত্তার আংটিটির কথা—আংটিটি ক্রমেই বড় হচ্ছে এবং ঝকঝকে রঙে চওড়া হচ্ছে। তার মধ্যে ঝলমল করছে তুষার-স্রোত। জল-বিন্দুগুলো ঘণ্টাধ্বনির মতো বাজছে এবং শুভ্র শিখায় চকচক করছে।

মুহূর্তে সে দেখলো সেই সব—যা বর্ণনা করা দরকার হয়েছে বিস্তর কথায়। তরুণ শিকারীরা, তরুণীরা, নারী ও পুরুষেরা যারা বিভিন্ন সময়ে তুষার-স্রোতের ফাঁকে তলিয়ে গেছে তারা সহাস্য মুখে জীবন্ত দাঁড়িয়ে আছে ; আর তাদের অনেক নিচে তলিয়ে যাওয়া

শহরগুলোর গির্জার ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে।

গির্জার ছাদের তলায় হাঁটু গেড়ে বসে আসে জনতা, বরফ-জলের মস্ত মস্ত জমাট ধারাগুলো হয়েছে অরগ্যানের নল। আর সকলের নিচে পরিষ্কার, স্বচ্ছ পীঠে বসে রয়েছে, তুষার-কুমারী, সে রাডির দিকে উঠে তার পায়ে চুমু দিলে। তখন একটা দারুণ ঠাণ্ডা, মৃত্যুর মতো অসাড়তা তার অঙ্গে অঙ্গে বয়ে গেল, বয়ে গেল বিদ্যুৎ-শক্ —তুষার ও আগুনের মিশ্রণ। এই দুটির হঠাৎ স্পর্শের মধ্যে কোনো পার্থক্য অনুভব করা যায় না।

তার বাইরে চারধারে ও মধ্যে শব্দ হচ্ছে, 'আমার! আমার! তুমি যখন ছোটটি ছিলে তখন তোমায় চুমো দিয়েছিলাম, চুমো দিয়েছিলাম তোমার মুখে। এখন চুমো দিচ্ছি তোমার পায়ে। তুমি সম্পূর্ণ আমার!'

সে অদৃশ্য হয়ে গেল নির্মল নীল জলে।

সব নিস্তব্ধ; গির্জার ঘণ্টাধ্বনি থেমে গেছে, শেষ প্রতিধ্বনিটি মিলিয়ে গেছে দিনান্তের মেঘের শেষ রঙিমার সঙ্গে।

ধ্বনিত হতে লাগলো গভীরতা থেকে, 'তুমি আমার!' ধ্বনিত হতে লাগলো উচ্চতা থেকে, 'তুমি আমারই।' অনন্ত থেকেও ধ্বনিত হতে লাগলো, একথা কয়টি।

মহিমাময়! ভালোবাসা থেকে ভালোবাসায়—ধরিত্রী থেকে স্বর্গে উড়ে যাওয়া!···

তোমরা কী এটিকে দুঃখের কাহিনী বলবে?

বেচারী বাবেতী! তার দুঃখ অবর্ণনীয়। নৌকোখানা দূরে আরও দূরে সরে গেলো। প্রধান ভূভাগে কেউ জানতে পারেনি, তারা দুজনে গেছে ছোট দ্বীপটিতে। সূর্য ডুবে গেলো, এলো অন্ধকার। সে একা দাঁড়িয়ে কাঁদছে—হতাশ।

এলো ঝড়! বিদ্যুৎ-চমকের পর চমক জুরা পর্বতমালাকে আলোকিত করতে লাগলো। চারধারে বিদ্যুৎ-চমক। বজ্র-ধ্বনিতে

ধ্বনিতে মিলে বাজতে লাগলো। বিদ্যুতের ঝলকানি কখন কখন সূর্যের মতো উজ্জ্বল হয়, বেলা দুপুরের মতো সবই দেখায় স্পষ্ট, পরিষ্কার; পরমুহূর্তেই সব ঢেকে যায় অন্ধকারে। প্রধান ভূভাগে লোকে নৌকাগুলো টেনে ডাঙার ওপরে তুলে রাখতে লাগলো; জীবন্ত যা-কিছু সব তাড়াতাড়ি আশ্রয়ে ঢুকলো। নামলো মুষলধারে বৃষ্টি।

মিল-মালিক বললেন, 'এই ঝড়-বৃষ্টিতে রাডি আর বাবেত্তি গেলো কোথায়?'

বাবেত্তি হাত জড়ো করে, হাঁটুতে মাথা ঠেকিয়ে নির্বাক হয়ে বসে আছে। সে আর কাঁদছে না।

সে ভাবছে, 'গভীর জলে! সে হ্রদের অতলে রয়েছে, যেন তুষার-স্রোতের তলায়।'

তারপর তার মনে পড়লো, রাডি তার মায়ের মৃত্যু ও তার নিজের রক্ষা পাওয়ার সম্বন্ধে যা বলেছিলো সে কথা; তাকে কীভাবে তুষার-স্রোতের তলা থেকে টেনে বার করা হয়।

'তুষার-কুমারী আবার তাকে পেয়েছে!'

বিদ্যুতের চমক সূর্যের আলোর মতো শাদা তুষার রাত্তির ওপর ঝকঝক করে উঠলো। বাবেত্তি চমকে উঠলো। সারা হ্রদকে তখন দেখতে লাগলো ঝলমলে তুষার-স্রোতের মতো। ঐ দাঁড়িয়ে আছে তুষার-কুমারী, রানীর মতো; তার ওপর রয়েছে নীলাভ আলো আর তার পায়ের কাছে পড়ে আছে রাডির মৃতদেহ।

সে বলছে, 'আমার!'

আবার চারধারে অন্ধকার, আর জল পড়ার বিকট শব্দ।

বাবেত্তি হাহাকার করে উঠলো, কতো নির্মম! যখন আমাদের সুখ-দিবসের প্রভাত হয়ে আসছিল তখন ও কেন মরবে? হে ঈশ্বর আমাকে তা বুঝবার শক্তি দাও।'

ঈশ্বর তার প্রার্থনা পূর্ণ করলেন। মনে পড়লো আগের দিনে

সে তার ও রাডির সম্বন্ধে যা সবচেয়ে ভালো হবে তার কথা বলেছিলো।

সে আঁধার রাতে সেখানে বসে কাঁদতে লাগলো। তার বোধ হলো, গাঢ় অন্ধকারের মধ্য দিয়ে, রাডি এই পৃথিবীতে যে শেষ কথাগুলি বলেছিলো, সেই কথাগুলি ধ্বনিত হচ্ছে ঃ 'ধরণীর এর বেশি আমাকে আর দেবার কিছু নেই!' কথাগুলি তখন ধ্বনিত হয়েছিলো; আনন্দের পূর্ণতায় এখন প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো দুঃখের অন্তস্তলের মধ্য দিয়ে।

সেই সময়ের পর থেকে বহু বছর চলে গেছে। হ্রদটি হাসছে, এবং তার কূলও হাসছে। আঙুরলতাগুলো ফুলে ওঠা ডালে ছেয়ে গেছে। তরঙ্গায়িত নিশান তুলে ষ্টীমারগুলো চলাচল করছে; প্রমোদ তরণীগুলো সবগুলো পাল তুলে জলের বুকে সাদা প্রজাপতির মতো সোঁ সোঁ করে চলেছে; চিলনকে অতিক্রম করে, রোন উপত্যকার গভীরে চলে গেছে রেল-পথ।

প্রত্যেক স্টেশনে বিদেশীরা নামে।···তারা চিলনে আসে এবং তিনটি বাবলাগাছের সেই ছোট দ্বীপটিও দেখে এবং গাইড বইয়ে পড়ে সেই তরুণ-তরুণীটির কাহিনীটি, যারা ১৮৫৬ সালের একটি দিনান্তে নৌকোয় করে সেখানে যায়, পড়ে বরের মৃত্যুর কথা, আর কনের হাহাকার।

নাইটিংগেল

তোমরা সকলেই তো জানো, চীনদেশের সম্রাট চীনা এবং তাঁর চারধারের যা-কিছু সবই চীনা। এখন, আমি যা বলতে যাচ্ছি, তা ঘটেছিলো অনেক বছর আগে। কিন্তু এটা আরও গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, গল্পটি ভুলে যাবার আগে তোমাদের এখনই শোনা উচিত।

সম্রাটের খুবই দামী মিহি চীনামাটির প্রাসাদটি ছিল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে জমকালো ও সুন্দর। কিন্তু সেইসঙ্গে ছিল এমন ঠুন্‌কো যে, ছুঁতেও ভয় করতো।

বাগানে ছিলো সবচেয়ে বাছা বাছা সুন্দর ফুল আর এসবের মধ্যে সবচেয়ে খাশা ছিলো ফুলগুলিরসঙ্গে বাঁধা ছোটো ছোটো রূপোর ঘন্টা। এই উদ্দেশ্যে যে, কেউ সেখান দিয়ে যাবার সময় তাদের টুংটাং আওয়াজে ফুলগুলোর দিকে না তাকিয়ে যেতে না পারে তা ঠেকানো। হাঁ! সম্রাটের বাগানে সবই ছিলো সাজানো-গোছানো, পরিপাটি। আর বাগানখানি ছিলো এতো বিস্তৃত যে, রানী নিজেই জানতো না তার শেষ কোথায়। তবে যে-কেউ বাগানখানি পার হয়ে গেলেই পৌছতো মস্ত মস্ত গাছে ভরা এক সুন্দর বনে, আর তা পার হয়ে গিয়ে পৌছতো সমুদ্রে।

বনটি গিয়েছিলো সমুদ্রকুল অবধি। সমুদ্র ছিলো খুব গভীর ও নীল। বড় বড় জাহাজ ডালগুলোর একেবারে তলা দিয়ে ভেসে যেতে পারতো। আর, ঐ ডালগুলোর মাঝে বাস করতো একটি নাইটিংগেল। সে এমন মিষ্টি সুরে গান গাইতো যে, গরিব জেলেটি রাতের বেলা জাল ফেলতে এসে তার অনেক কাজ থাকা সত্ত্বেও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সেই গান শুনতো। সে বলতো, 'আহা! কী সুন্দর!' কিন্তু তার কাজে মন দিতে সে বাধ্য হতো এবং পাখিটির কথা ভুলে যেতো।

তবু পরের রাতে নাইটিংগেলটি যদি আবার গান গাইতো, আর জেলেটি কাজে বার হতো, তাহলে আবার বলতো, 'আহা! কী সুন্দর!'

পৃথিবীর প্রত্যেক অঞ্চল থেকে সম্রাটের শহরে আসতো পর্যটকেরা। তাঁরা শহরের, প্রাসাদের ও বাগানখানির তারিফ করতেন। কিন্তু নাইটিংগেলটির গান শুনে বলতো, 'এইটিই সবার সেরা। তাঁরা বাড়ি ফিরে গিয়ে পাখিটির গল্প করতেন আর পণ্ডিতেরা লিখতেন শহর, রাজপ্রাসাদ ও বাগানখানি সম্বন্ধে বই। তাঁরা নাইটিংগেলটির কথাও ভুলতেন না; সবার চেয়ে সুখ্যাতি করতেন তার এবং কবিরা লিখতেন সমুদ্রকুলের সেই বনের নাইটিংগেলটি সম্বন্ধে অতি সুন্দর সুন্দর কবিতা।

এই সব বই পৃথিবী ঘুরতো। অবশেষে একখানি গিয়ে পড়ে সম্রাটের হাতে। তিনি বসেছিলেন তাঁর সোনার সিংহাসনে। সম্রাট বইখানি বারবার পড়েন আর প্রতি মুহূর্তে মাথা দোলান। কারণ, শহর, রাজপ্রাসাদ ও বাগানের চমৎকার বর্ণনায় তিনি খুব খুশি। বইয়ে লেখা ছিলো, 'কিন্তু সবার সেরা হচ্ছে নাইটিংগেলটি।'

সম্রাট বলেন, 'এ আবার কী? নাইটিংগেল! আমি তো এর কিছুই জানি না। আমার সাম্রাজ্যে এমন কী আমার বাগানে এ ধরনের কোনো পাখি থাকতে পারে, যার গান আমি শুনিনি? বাস্তবিকই লোকে এই বই পড়ে কিছু শিখতে পারে।'

তিনি তাঁর পার্শ্বচরকে ডেকে পাঠালেন। এখন, পার্শ্বচরটি ছিলেন এমন মানুষ যে, তাঁর নিচু পদের কেউ তাঁর সঙ্গে কথা কইতে পারতো না। আর কেউ যদি সাহস করে তাঁকে কোনো কথা জিগ্যেস করতো, তাঁর একটিমাত্র জবাব ছিল 'শা', যার বিশেষ কোনো মানে ছিল না।

সম্রাট বলেন, 'বইয়ে লেখা রয়েছে যে, এখানে নাইটিংগেল নামে একটি পাখি আছে। লোকে বলে, আমার সাম্রাজ্যে সবকিছুর মধ্যে তার গানই মূল্যবান। এতোদিন কেউ আমাকে তার কথা বলেননি কেন?'

পার্শ্বচর বলেন, 'তার কথা কখনো শুনিনি। সম্রাটের দরবারে তাকে কখনো হাজির করা হয়নি।'

সম্রাট বলেন, 'আমার ইচ্ছা, সে আজ সন্ধ্যায় আমার সামনে গান গাইবে। সারা পৃথিবী জানে আমার কী আছে অথচ আমি নিজেই তা জানি না!'

পার্শ্বচর বলেন, 'আমি আগে কখনো তার কথা কাউকে বলতে শুনিনি। কিন্তু তার খোঁজ করবো, তাকে খুঁজে বার করবো।'

পার্শ্বচর একবার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলেন, আর এক সার দিয়ে নিচে তরতর করে নেমে এলেন। ঘরের পর ঘর ছুটোছুটি করতে থাকেন। যাদেরই সঙ্গে দেখা হয় তাদের কেউই নাইটিংগেলটির কথা শোনেনি। তখন সম্রাটের কাছে ফিরে এসে বলেন, 'যিনি বইখানি লিখেছেন, ওটা তাঁরই কল্পনা। বইয়ে যা লেখা থাকে মহামান্য সম্রাট তা বিশ্বাস করবেন না। ও সবের বেশির ভাগই স্রেফ বানানো, যাকে বলে জাদু।'

সম্রাট বলেন, 'কিন্তু যে বইখানি পড়েছি সেখানি পাঠিয়েছেন মহাপরাক্রান্ত জাপান সম্রাট। সুতরাং তাঁর কথা অসত্য হতে পারে না, আমি নাইটিংগেলটির গান শুনতে চাই। আজ সন্ধ্যায় তাকে এখানে হাজির হতে হবে। সে যদি না আসে তাহলে রাতে ভোজের পর রাজসভার সকলকে চাবুক মারা হবে।'

পার্শ্বচরটি বলে ওঠেন, 'চীং সি।' আবার তিনি ছুটতে ছুটতে ওপরে ওঠেন। নিচে নামেন, ঘরে ঘরে বারান্দায় বারান্দায় ছুটোছুটি করেন। অর্ধেক রাজসভা তাঁর সঙ্গে ছুটতে থাকে। কারণ, তাঁদের মধ্যে একজনও চাবুক খেতে রাজি ছিলেন না। নাইটিংগেলটি সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন হতে থাকে। সারা পৃথিবীতে তার কথা হয় অথচ রাজসভার কেউই তার সম্বন্ধে কিছুই জানে না।

অবশেষে তাঁরা রান্নাঘরে এক গরিব ছোট্ট চাকরানীর দেখা পেলেন। সে বললে, 'ও! হাঁ, নাইটিংগেল? আমি তাকে খুব ভালো

করে জানি। সে কী চমৎকার গান গাইতে পারে! খাবার টেবিলে যে এঁটো-কাঁটা পড়ে থাকে সেগুলো কুড়িয়ে রোজ সন্ধ্যায় আমার পীড়িতা মায়ের জন্যে নিয়ে যাই। সে থাকে সমুদ্রের ধারে, ফিরে আসবার সময়ে বনের মধ্যে যখন একটু জিরিয়ে নিই, তখন নাইটিংগেলটির গান শুনি। গান শুনে আমার চোখে জল আসে। ঠিক যেন আমার মা আমায় চুমো খাচ্ছেন।'

পার্শ্বচরটি বলেন, 'দেখ বাছা! তুমি যদি সেই বনে নাইটিংগেলটির কাছে নিয়ে যাও তাহলে তোমাকে রান্নাঘরে নিশ্চয় একটা কাজ যোগাড় করে দেবো। সেই সঙ্গে দেবো মহামান্য সম্রাটের খাওয়া দেখবার অনুমতি। কারণ, আজ সন্ধ্যায় তাঁর রাজসভায় আসার কথা।'

তাই দুজনে একসঙ্গে রওনা হন সেই বনে যেখানে পাখিটি গান গাইতো। অর্ধেক রাজসভা চললো তাঁদের সঙ্গে। যাবার পথে থেকে থেকেই একটা গরু ডেকে ওঠে 'হাম্বা'।

রাজসভার ছোকরা-চাকরেরা অমনি বলে, 'ও এবার ওকে ধরেছি! অতো ছোট একটা জীবের পক্ষে আশ্চর্য কণ্ঠস্বর বটে।'

রান্নাঘরের বাচ্চা চাকরানীটি বলে, 'না! আপনারা গরুর ডাক শুনছেন। আমরা এখনও সেখান থেকে দূরে রয়েছি।'

তখন পুকুরে ডকছিল ব্যাং।

অমনি রাজার মুখ্য প্রচারক বলে ওঠেন, 'বাহ্‌বা! এবার তার গান শুনতে পাচ্ছি। ঠিক যেন গির্জার ছোটো ছোটো ঘণ্টা বাজছে।'

রান্নাঘরের ছোট্ট চাকরানীটি বলে, 'না, ওগুলো ব্যাং। কিন্তু মনে হচ্ছে এবার শিগগিরই তার গান শুনবো।'

তার পরই নাইটিংগেলটি গান শুরু করে।

ছোট্ট মেয়েটি বলে, 'ঐ যে সে! শুনুন! শুনুন! ঐ সে বসে আছে।'

গাছের উঁচু ডালে একটি ধূসর রঙের ছোট্ট পাখিকে সে আঙুল দিয়ে দেখায়।

এক পারিষদ বলেন, 'এ কী সম্ভব ?···কী রকম সাধারণ গোছের দেখাচ্ছে। এতোগুলো বিশিষ্ট লোক দেখে পাখিটা নিশ্চয় রং পালটেছে।'

ছোট্ট চাকরানীটি বলে, 'ওগো ছোট্ট নাইটিংগেল! আমাদের মহানুভব সম্রাটের ইচ্ছে, তুমি তাঁকে কিছু গান শোনাও।'

'সানন্দে'—ব'লে নাইটিংগেলটি এমনভাবে গান গাইতে থাকে যে শুনতে খুব ভালো লাগে।

সেই পারিষদটি বলেন, 'ঠিক বেলোয়ারির টুংটাং আওয়াজের মতো শোনাচ্ছে। ওর ছোট্ট গলাটি দেখুন, কী রকম নড়ছে! ভারি অদ্ভুত যে, আমরা আগে কখনো ওর গান শুনিনি, রাজসভায় ওর প্রশংসা হবে।'

নাইটিংগেলটি বলে, 'সম্রাটকে আবার গান শোনানো কী?' কারণ, সে মনে করে তাদের মধ্যে সম্রাট আছেন।

পারিষদটি বলেন, 'ওগো, নাইটিংগেল! তুমি খুব চমৎকার! তোমাকে রাজসভার একটি উৎসবে আমন্ত্রণ জানিয়ে সম্মান বোধ করছি। উৎসবটি হবে আজ সন্ধ্যায়। তখন মহামান্য সম্রাট তোমার গান শুনে মুগ্ধ হবেন।'

নাইটিংগেলটি বলে, 'আমার গান সবুজ গাছ-পালার মধ্যে অনেক ভালো শোনাবে।'

কিন্তু যখন সে শুনলো সম্রাটের ইচ্ছা তখন সে স্বেচ্ছায় তাদের সঙ্গে যায়।

রাজপ্রাসাদে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। সাজানো-গোছানো ঘষামাজা চলতে লাগলো। দেয়াল ও মেঝেগুলো ছিলো আগাগোড়া চীনামাটির। হাজার সোনার প্রদীপের আলোয় সে সব ঝকঝক করতে লাগলো। যাতায়াতের পথে রাখা হলো সবচেয়ে খুশি করা ছোট্ট ছোট্ট রূপোর ঘণ্টা বাঁধা খুব সুন্দর সুন্দর ফুল। সেখান দিয়ে এমন ছুটোছুটি হতে লাগলো যে, তাতে ঘণ্টাগুলো বাজতে শুরু

করলো। আর সেই আওয়াজে নিজের কথাই কেউ শুনতে পেল না।

বিশাল দরবার-ঘরে যেখানে সম্রাট বসেন তার মাঝখানে নাইটিংগেলটির জন্যে রাখা হলো সোনার দাঁড়। রাজসভায় সকলেই উপস্থিত। রান্নাঘরের সেই ছোট্ট চাকরানীটিও দরজার আড়ালে দাঁড়াবার অনুমতি পেয়েছে। তার উপাধি এখন, 'রান্নাঘরের ঝি'। সকলেই পরেছেন সবচেয়ে সুন্দর পোশাক। সকলেরই চোখ ধূসর রঙের ছোট্ট পাখিটির দিকে। সম্রাট মাথা দুলিয়ে তাকে গান গাইতে ইঙ্গিত করলেন।

আর, নাইটিংগেলটি এমন মিষ্টি সুরে গান গাইতে লাগলো যে, সম্রাটের চোখে জল এলো; তাঁর গাল বেয়ে চোখের জল পড়তে লাগলো। নাইটিংগেলটি আরও মধুর সুরে গেয়ে চললো। সেখানে যারা ছিলো, সে সুর তাদের সকলের হৃদয় স্পর্শ করলো। আর, সম্রাট এতো খুশি হলেন যে, বললেন, 'নাইটিংগেলটি আমার পায়ের এই সোনার চটি জোড়া গলায় পরে থাকবে।'

কিন্তু নাইটিংগেলটি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলে যে, সে ইতিমধ্যে যথেষ্ট পুরস্কার পেয়েছে।

'আমি দেখেছি সম্রাটের চোখে জল। যে পুরস্কার পেতে পারি ওটাই হচ্ছে, সবচেয়ে বড় পুরস্কার। সম্রাটের চোখের জলের বিশেষ দাম আছে। ঈশ্বর জানেন, আমি যথেষ্ট পুরস্কার পেয়েছি।' আবার সে মধুর সুরে গাইতে লাগলো।

রাজসভার মহিলারা বললেন, 'এমন মন-ভোলানো গলা আগে কখনো জানতাম না।' তাঁরা মুখে জল পুরে কথা কইবার সময়ে নাইটিংগেলটির মতো গলা কাঁপাতে লাগলেন। ভাবলেন, নাইটিংগেল হবেন। এমন কী, দারোয়ান ও রানীর পরিচারিকারাও বললে, তারা সন্তুষ্ট। এ এক মস্ত ব্যাপার বলতে হবে। কারণ, সকলের চেয়ে তাদের খুশি করা খুব কঠিন।

বাস্তবিকই নাইটিংগেলটির সফলতা একেবারে পূর্ণ হলো।

এখন থেকে তাকে রাজসভায় থাকতে হবে। তার নিজের খাঁচা চাই। তবে দিনে দুবার, রাতে একবার উড়ে যাবার অনুমতি দেওয়া হলো। তার পায়ে বাঁধা রেশমের ফিতে ধরবার জন্য বারোজন চাকর মোতায়েন করা হলো। তারাও বেশ ভালো করে কাজে লেগে রইলো।

কিন্তু এভাবে বাইরে ঘুরতে যাওয়ায় আনন্দ নেই।

সারা শহরের লোকের মুখে নাইটিংগেলটির কথা। দুটি লোকের পরস্পরের সঙ্গে দেখা হলেই একজন বলে, 'নাইট', অপরজন বলে, 'গেল' এবং তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেই পরস্পরকে বেশ বুঝতে পারে। এবং নগরের এগারোটি ছেলেমেয়ের নাম রাখা হলো 'নাইটিংগেল', কিন্তু তাদের একজনেরও গলায় নাইটিংগেলের সুর ছিলো না।

একদিন সম্রাটের নামে এলো এক মস্ত বাণ্ডিল। তার ওপর লেখা 'নাইটিংগেল'।

সম্রাট বলেন, 'আমাদের বহুদূর খ্যাত পাখিটি সম্বন্ধে এই আর একখানা নতুন বই।'

কিন্তু সেটি কোনো বই ছিল না, একটি বাক্সের মধ্যে একটি কল —একটি নকল নাইটিংগেল ; আসল নাইটিংগেলের মতো দেখায় এমনভাবে তৈরি। তার গায়ে পালক নেই, তার বদলে হীরে, রুবি ও মণি। তাতে দম দিলেই আসল নাইটিংগেলের একটা সুর বাজে। আর তখন সোনা-রূপোর ঝলমল-করা তার লেজটি নাচে। তার গলায় একটি ফিতে বাঁধা। তার গায়ে লেখা, 'জাপান-সম্রাটের নাইটিংগেলের তুলনায় চীন-সম্রাটের নাইটিংগেলটি হীন।'

প্রত্যেকেই বললে, 'অতি চমৎকার!' আর, যে লোকটি নাইটিংগেলটি এনেছিলো তার উপাধি হলো 'সম্রাটের প্রধান নাইটিংগেল আনয়নকারী।'

'এখন ওরা দুটিতে একসঙ্গে গাইবে। আমরা দ্বৈত-সংগীত শুনবো।'

সুতরাং তাদের একসঙ্গে গাইতেই হবে। কিন্তু তা সফল হলো না ; আসল নাইটিংগেলটি গাইলো তার নিজের মতো করে, আর নকলটির সুর বার হলো তার চাকার জোরে।

শিল্পী বললেন, 'এটা ওর দোষ নয়। ওকে একটি পদ্ধতি ধরে তাল বজায় রেখেই গাইতে হবে।

তাই নকল পাখিটিকে এখন গাইতে হবে একা। সে আসল পাখিটির মতোই গাইলো। আর, তাকে দেখতে লাগলো আরও সুন্দর। তার পালক মণি-মুক্তোর মতো ঝলমল করতে লাগলো।

সে তেত্রিশবার একই সুর গাইলো ; তবু একটুও ক্লান্ত হলো না। প্রত্যেকে তার গান স্বেচ্ছায় বারবার শুনতে চাইলো। যাহোক, সম্রাট এখন ইচ্ছা করলেন, আসল নাইটিংগেলটি একটা কিছু গান করুক— কিন্তু সে কোথায় ? কেউ লক্ষ্যই করেনি যে, সে খোলা জানলাটি দিয়ে উড়ে চলে গেছে—উড়ে গেছে তার নিজের সবুজ বনে।

সম্রাট বললেন, 'এর মানে কী ?'

সভাসদরা নাইটিংগেলটিকে গাল দিতে লাগলেন। বললেন, 'অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ।' আর, তারা বললেন, 'যাহোক আমাদের সবচেয়ে ভালো পাখিটা আছে।' এবং চৌত্রিশবার তারা একই সুর শুনলেন, তবু ধরতে পারলেন না, সুরটা এমন কঠিন।

শিল্পী পাখিটার খুব প্রশংসা করলেন। বললেন, 'আসল নাইটিংগেলটির চেয়ে অনেক ভালো, কেবল রূপে নয়, গুণেও।' কারণ, আপনারা প্রত্যেকে, বিশেষ করে মহামান্য সম্রাট লক্ষ্য করুন আসল পাখিটার বেলায় কেউ জানতেই পারতো না কী হবে, কিন্তু নকল পাখিটার বেলায় সবই ধরা-বাঁধা ও এই একই ভাবে গান গাইবে, অন্য ভাবে নয়। এটা প্রমাণ করা যেতে পারে। ওটাকে একটু টুকরো টুকরো করে খুলে ভেতরের কল-কব্জা সব দেখানো যায়—চাকাগুলো কোথায় বসানো আছে, কেমন করে সেগুলো চলে, একটার পর একটা কেমন করে ঘোরে।'

প্রত্যেকেই বললেন, 'আমার ঠিক তাই মনে হয়।' শিল্পীটি পরের রবিবারে পাখিটি জনসাধারণকে দেখাবার অনুমতি পেলেন।

সম্রাট বললেন, 'ওর গান ওদের শোনা উচিত।'

তাই লোকে তার গান শুনলো, তারা এমন খুশি হলো যেন চা খাচ্ছে—কারণ, চা চীনেদের মনে স্ফূর্তি আনে। সকলে বললেন, 'ওহো!' এবং তর্জনী তুলে মাথা দোলাতে লাগলো। কিন্তু সে ছেলেটি আসল নাইটিংগেলটির গান শুনেছিল, সে বললে খুব সুন্দর বাজছে, অনেকটা আসল নাইটিংগেলের মতো। তবে কিসের যেন অভাব আছে, জানি নে সেটা কী।'

যাহোক, আসল নাইটিংগেলটিকে সাম্রাজ্য থেকে বহিষ্কার করা হলো।

নকল নাইটিংগেলটির জায়গা হলো সম্রাটের বিছানার কাছে, মখমলের গদির ওপর। সে যে-সব সোনা, দামী দামী মণি-রত্ন উপহার পেতে লাগলো, সেগুলো রইলো তার চারধারে। তার উপাধি হলো, 'ভোজের পর টাটকা ফল খাবার সময়ের প্রধান গায়ক।' সেজন্য তার আসন হলো বাঁদিকে প্রথম। কারণ, সম্রাট মনে করেন, যেদিকে হৃৎপিণ্ড থাকে সেদিকটা খুব সম্মানের। আর সম্রাটের বাঁ দিকেই হৃৎপিণ্ড যেমন আর সব মানুষের আছে।

শিল্পীটি নকল পাখিটার বিষয় খুব কঠিন লম্বা লম্বা শব্দ দিয়ে এক কুড়ি পাঁচখানা মোটা বই লিখে ফেললেন। সে সব শব্দ কেবল চীনা ভাষাতেই পাওয়া যায়। সুতরাং সকলেই বললে, তারা বইগুলো পড়েছে শব্দগুলোর মানেও বুঝেছে। নতুবা লোকে তাদের বলবে, নির্বোধ এবং হয়তো চাবুকও খেতে হতে পারে।

এইভাবে বছর কেটে গেল।

সম্রাট, সভাসদরা সকলে, এবং সমস্ত চীনার নকল পাখিটিরগান মুখস্থ হয়ে গেলো। সেই কারণেই তারা খুব ভালো করে উপভোগ করতে লাগলো এবং তার সঙ্গে গাইতেও লাগলো। রাস্তার ছোটো

ছোট ছেলেগুলো গাইতে লাগলো, 'জিজিজি, ক্লাক, ক্লাক, ক্লাক।' আর, সম্রাট নিজেও গাইতে লাগলেন—'বাস্তবিকই ভারি চমৎকার!'

কিন্তু একদিন সন্ধ্যায় পাখিটি যখন গলা ছেড়ে গান গাইছে, সম্রাট বিছানায় শুয়ে আছেন, হঠাৎ একটা শব্দ হলো, 'খট্'—আর পাখিটার মধ্যে কী যেন করে উঠলো, 'খর্‌র্‌র্। সবগুলো চাকা ঘুরতে লাগলো, গান গেলো থেমে।

সম্রাট বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠলেন। তাঁর প্রধান চিকিৎসককে ডেকে পাঠানো হলো। কিন্তু তিনি কীই বা করতে পারেন!

অবশেষে একজন ঘড়ি-কারিগরকে ডেকে আনা হলো এবং অনেক আলোচনার পর 'পাখিটাকে অনেকটা মেরামত করা হলো। কিন্তু ঘড়ি-কারিগর বললে, 'পাখিটাকে দিয়ে কম গান গাওয়াতে হবে। কারণ, আলগুলো ক্ষয়ে গেছে; সেগুলোকে নতুন করা অসম্ভব…'

তাতে সকলের খুব দুঃখ হলো। কারণ, নকল পাখিটিকে গাইতে দেওয়া হলো বছরে মাত্র একবার। এমন কী তাতেও গোলযোগ দেখা গেলো। যাহোক, শিল্পী লম্বা লম্বা কথা দিয়ে সংক্ষেপে এক বক্তৃতা দিলেন। বললেন, 'পাখিটা আগের মতোই ভালো আছে।' সুতরাং সে আগের মতোই ভালো আছে।

বছর পাঁচেক কাটার পর সারা সাম্রাজ্যে দুর্দিন এলো। কারণ, সকলেই সম্রাটকে মনে মনে ভালোবাসতো। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। খবর পাওয়া গেলো তিনি আর বাঁচবেন না। একজন নতুন সম্রাট নির্বাচন করা হলো। লোকে রাজবাড়ির বাইরে পথে দাঁড়িয়ে পার্শ্বচরকে জিগ্যেস করলে, 'সম্রাট কেমন আছেন?'

তিনি 'না'—বলে মাথা নাড়লেন।

সম্রাটের দেহ শীতল, মুখ ফ্যাকাশে; তাঁর জমকালো বিছানায় পড়ে আছেন। রাজসভার সকলের বিশ্বাস হলো, সম্রাট মারা গেছেন তারা প্রত্যেকে নতুন সম্রাটকে অভিবাদন করতে ছুটলো। পুরুষেরা

বিষয়টি নিয়ে গুলতানি করতে বেরিয়ে পড়লো আর পরিচারিকারা দল বেঁধে কফি খেতে লাগলো।

সব ঘরে ও বারান্দায় কাপড় বিছিয়ে দেওয়া হলো, যাতে পায়ের শব্দ একটুও না শোনা যায়। সব নিঃস্তব্ধ—একদম নিঝুম। কিন্তু সম্রাট তখনও মারা যান নি। তিনি অসাড় ও ফ্যাকাশে হয়ে তাঁর জমকালো বিছানায় শুয়ে আছেন। বিছানার চারধারে সোনার ভারি 'ট্যাশেল' দেওয়া মখমলের ঝালর, ওপরে একটা জানালা খোলা। তার ভেতর দিয়ে সম্রাট ও নকল পাখিটার ওপর চাঁদের আলো এসে পড়েছে।

বেচারী সম্রাট অতি কষ্টে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। তাঁর বোধ হচ্চে তাঁর বুকের ওপর কিছু বসে আছে। তিনি চোখ মেলে দেখেন, সেটা মৃত্যু। সে মাথায় পরেছে সম্রাটের মুকুট। তার এক হাতে সোনার তলোয়ার আর একহাতে রাজকীয় জমকালো নিশান। পুরু মখমলের ঝালরের ভাঁজগুলো থেকে বেরিয়েছিল কতকগুলো মাথা। সেগুলোর কতক বিকটাকার, কতকগুলো দেখতে মনোরম। তারা সম্রাটের সব কু ও সুকর্ম। মৃত্যু যখন তাঁর বুকের ওপর চেপে বসেছে, তখন তারা তাঁর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

তারা একে একে ফিস্‌ফিস্ করে বলছে, 'আমাকে চিনিস্'? 'সে কথা তোর মনে পড়ে?' তারা তাকে এমনভাবে ভৎর্সনা করছে যে, তাঁর কপালে ঘাম দেখা দিলো।

সম্রাট বলে ওঠেন, 'কখনো এ ধরনের কিছু জানতে পারি নি। সংগীত! সংগীত! প্রকাণ্ড চীনে ঢাক বাজাও। ওরা যা বলছে, তা যেন শুনতে না পাই।'

তারা তবু বলে যায়। আর, মৃত্যু চীনেদের মতো করে তাদের প্রত্যেক কথায় মাথা দোলাতে থাকে।

সম্রাট চিৎকার করে ওঠেন, 'গান! গান। হে আমার প্রিয় খুদে নকল পাখি! মিনতি করি, গান গাও। আমি তোমাকে

দিয়েছি সোনা, দিয়েছি দামী পাথর। এমন কী তোমার গলায় বেঁধে দিয়েছি, আমার সোনার চটি দুটি। গাও, মিনতি করছি, গান গাও।'

কিন্তু পাখিটা চুপ করে থাকে। তাকে দম দেবার কেউ যে সেখানে নেই। দম না দিলে তো সে গাইতে পারে না। মৃত্যু তার মস্ত চোখের শূন্য কোটর দিয়ে তাঁর দিকে তেমনি তাকিয়ে আছে। আর, সর্বত্র নিঝুম—ভয়ংকর নিঝুম!

হঠাৎ জানালাটি থেকে সবচেয়ে মধুর গান শোনা যেতে লাগলো। সেই ছোট্ট জীবন, নাইটিংগেলটি বাইরে একটি ডালে বসে ছিলো। সে সম্রাটের কঠিন অসুখের কথা শুনেছিল; এসেছে তাঁকে গান শুনিয়ে আরাম ও আশা দিতে। সে যতো গায় সেই ছায়ামূর্তিগুলো ততো ম্লান হয়ে যেতে থাকে। আর, দুর্বল অঙ্গ-প্রতঙ্গে ক্রমে বেশি করে রক্তধারা বয়ে যায়। এমন কী মৃত্যুও সে গান শুনতে শুনতে বললে, 'গেয়ে যাও, ছোট্ট পাখিটি, গেয়ে যাও।'

'আমাকে সুন্দর সোনার তলোয়ারখানি দেবে কী? দেবে কী মনোরম নিশানখানি, সম্রাটের মুকুটটি?'

মৃত্যু একটি গানের বিনিময়ে সে সব ধন-রত্ন তাকে দান করলো। আর নাইটিংগেলটি সামনে গাইতে লাগলো। সে গাইতে লাগলো নিঃস্তব্ধ-শান্ত গির্জার আঙিনার গান, যেখানে ফোটে সাদা গোলাপ, লিলাক ছড়ায় গন্ধ, শিশিরের মতো ভিজিয়ে দিল তাজা ঘাস—পরলোকে যারা চলে গেছে, যেন তাদের বন্ধুদের চোখের জল। তাই শুনতে শুনতে মৃত্যু তার বাগানখানির জন্য ব্যাকুল হয় এবং ঠাণ্ডা সাদা ছায়ার মতো জানালাটি দিয়ে বেরিয়ে উড়ে চলে যায়।

সম্রাট বলেন, 'ধন্য, ধন্য, তুমি ছোট্ট স্বর্গীয় পাখি। আমি তোমায় ভালো করে চিনিনি। আমার সাম্রাজ্য থেকে তোমাকে নির্বাসিত করেছি। আর, তুমি গান গেয়ে ঐ সব বিকট মুখগুলো আমার বিছানা থেকে আর মৃত্যুকে আমার অন্তর থেকে দূর করে দিয়েছো।'

নাইটিংগেলটি বলে, 'আপনি তো আমায় আগেই পুরস্কার

দিয়েছেন। আমি প্রথমবার যখন আপনাকে গান শোনাই তখন আপনার চোখে জল দেখেছি ! সে আমি কখনো ভুলব না। সেগুলো হচ্ছে মণি-রত্ন। গায়কের অন্তর যাতে আনন্দে ভরে যায়। কিন্তু এখন ঘুমোন। ঘুম থেকে সুস্থ, সতেজ হয়ে উঠুন। আমি গান গেয়ে আপনাকে ঘুম পাড়াবো।'

সে গাইতে লাগলো। সম্রাট মধুর ঘুমে আচ্ছন্ন হলেন। আহা ! সে ঘুম কতো কোমল আর কত মধুর !

যখন সুস্থ-সবল হয়ে তাঁর ঘুম ভাঙলো তখন জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে। পরিচারকদের তখনও একজনও ফিরে আসেনি। তারা মনে করেছে, সম্রাটের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু নাইটিংগেলটি তখনও বসে গান গাইছে।

সম্রাট বলেন, 'তুমি সব সময়ে আমার কাছে থাকবে। তোমার খুশিমতো যখন ইচ্ছা গান গাইবে। আর, ঐ নকল পাখিটাকে টুকরো করে ভেঙে ফেলবো।'

নাইটিংগেলটি বললে, 'তা করবেন না। ও যা করতে পারতো তা করেছে। ওর যত্ন করবেন। আমি রাজবাড়িতে থাকতে পারি না। আমার খুশিমতো আমায় আসতে দিন। সন্ধ্যায় জানালাটির কাছে ডালে এসে বসবো, আর আপনাকে গান শোনাবো যাতে আপনি সুখী হন, আপনার মন ভাবে ভরে ওঠে।'

'আপনাকে গান শোনাবো সুখীর, শোনাবো দুঃখীর। আপনাকে শোনাবো যা-কিছু ভালো, যা-কিছু মন্দ তার গান যা রয়েছে আপনার অগোচরে। সম্রাট, এই ছোট গায়িকাটি উড়ে যায় ধীবরের কুঁড়েতে, যায় চাষির ছোট ঘরে, যায় তাদের সকলেরই কাছে—যারা আপনার কাছ থেকে, আপনার দরবার থেকে রয়েছে দূরে। আপনার মুকুটের চেয়ে আপনার হৃদয়কে আমি বেশি ভালোবাসি··· আমি আসবো, গান গাইবো, কিন্তু আপনাকে একটি বিষয় প্রতিজ্ঞা করতে হবে।'

সম্রাট বলেন, 'সব কিছু'। এবং তিনি সম্রাটোচিত জমকালো

পোশাকে উঠে দাঁড়ান। পোশাকটি তিনি নিজেই পরেছিলেন এবং বুকের কাছে ধরে ছিলেন ভারি সোনার তলোয়ারখানি।

'কেউ যেন জানতে না পারে আপনার একটি ছোট পাখি আছে সে আপনাকে সবকিছু বলে। আপনার কাছে আমার এই প্রার্থনা তাহলে সব ভালোভাবে চলবে।'

এই বলে পাখিটি উড়ে চলে যায়।

পরিচারকেরা তাদের মৃত সম্রাটকে দেখতে আসে। কিন্তু ও কী! তারা সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই সম্রাট বলে ওঠেন, 'সু-প্রভাত!'

অবিচল টিনের সেপাই

এক সময়ে পঁচিশটি টিনের সেপাই ছিলো। তারা ছিল পরস্পরের ভাই। কারণ, তাদের সকলকে তৈরি করা হয় একটা পুরনো টিনের চামচ থেকে। তাদের হাতে ছিল মাস্‌কেট, সকলেই ছিলো একদম খাড়া, তাদের পোশাক ছিলো লাল ও নীল—সত্যি খুব চটকদার।

তারা যে বাক্সে ছিলো তার ঢাকনা খুলতেই যে কথাগুলো পৃথিবীতে প্রথম শোনে তা হচ্ছে 'টিনের সেপাই'!

এই কথাগুলো যে বললে সে একটি ছোটো ছেলে। কথা কয়টি কইতে কইতে সে হাততালি দেয়। ওদিন তার জন্মদিন। তাই তাকে সেগুলো দেওয়া হয়েছিলো। তখন সে টেবিলের ওপর সেগুলোকে সাজিয়ে রাখছিলো।

সেপাইগুলোকে দেখতে ছিলো একইরকমের—একচুলও আলাদা নয়। তবে একটা ছিলো সবগুলো থেকে অন্য রকমের। তার পা ছিলো মাত্র একখানি। কারণ তাকে তৈরি করা হয়, সবশেষে। যতোটা দরকার তখন ততোটা টিন ছিলো না। যাহোক, অন্যেরা তাদের দুপায়ে যতোটা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলো, সে তার এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো ঠিক ততোটাই শক্তভাবে। আর আমাদের মনে হয়, এই টিনের সেপাইটির ভাগ্যকথা লিখে রাখার যোগ্য।

যে টেবিলে টিনের সেপাইগুলো সাজিয়ে রাখা হচ্ছিলো, তার ওপর ছিলো আরও কতকগুলো খেলনা। কিন্তু সেগুলোর মধ্যে দেখতে সব চেয়ে সুন্দর ছিলো, একটি পিচবোর্ডের কাসল্। তার খুদে জানলাগুলোর মাঝ দিয়ে ঘরগুলোর ভিতর দেখা যাচ্ছিলো। কাসল্‌টার সামনে একখানি ছোট্ট আয়নার চারধারে ছিলো কতকগুলো খুদে গাছ। আয়নাখানি দিয়ে একটা হ্রদ তৈরি করা হয়েছিলো। আর সেই হ্রদে সাঁতার কাটছিলো মোমের রাজহাঁস। তার বুকে প্রতিবিম্বিত হচ্ছিলো সে সবের ছায়া।

এ সব তো ছিলো খুবই সুন্দর, কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর ছিলো কাসল্‌টির সামনে খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা ছোটো মেয়েটি। তাকেও তৈরি করা হয়েছিলো পিচবোর্ড কেটে। কিন্তু তার পরনে ছিলো সবচেয়ে স্বচ্ছ মসলিনের ফ্রক। কাঁধে স্কার্ফের মতো করে ফেলা ছিলো আকাশী রঙের একখানি রিবন। আর তার মাঝখানে বসানো ছিলো একখানি ঝকমকে সোনালি পাখা। ছোট্ট মহিলাটি তার হাত দুখানি মেলে দিয়েছিলো। কারণ সে নর্তকী। তার একখানি পা এতো উঁচুতে তুলেছিলো যে, টিনের সেপাইটি তা দেখতেই পাচ্ছিলো না। তাই মনে করছিলো, তারই মতো ওরও বুঝি একখানি পা।

সে ভাবলো, 'মেয়েটি ঠিক আমারই যোগ্য কনে হবে। কিন্তু ও বড় ঘরের মেয়ে, কাস্‌লে থাকে, আর, আমার থাকবার জন্যে আছে একটা বাক্স।'

'যাহোক, ওর সঙ্গে পরিচয় করলে কোনো ক্ষতি হবে না।' তাই সে টেবিলের ওপরে একটা নস্যির বাক্সের পিছনে দাঁড়ালো। সেখান থেকে সে সেই রোগা মহিলাটির সমস্ত চেহারা পরিষ্কার দেখতে পেলো, মেয়েটি তখনও না পড়ে এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো।

সন্ধ্যা হলে, আর সব টিনের সেপাইকে বাক্সে পুরে রেখে বাড়ির সকলে শুতে গেলো। তখন খেলনাগুলো একে একে খেলা শুরু করলো। তারা দেখা-সাক্ষাতের ভান করতে লাগলো, লড়াই করতে লাগলো, নাচতে লাগলো। টিনের সেপাইগুলোও খড় খড় করতে লাগলো। কারণ, তাদেরও খেলবার ইচ্ছা। কিন্তু বাক্সটার ঢাকনা খুললো না। বাদাম-ভাঙা খুদে হাতুড়িগুলো লাগিয়ে উঠতে লাগলো শ্লেট-পেনসিলটা শ্লেটে হিসাব-নিকাশের খেলা খেলতে লাগলো। এমন গোলমাল হতে লাগলো যে, খাঁচার ক্যানারিটার ঘুম ভেঙে গেলো। সেও কথা বলতে লাগলো। কিন্তু সে সব সময় কথা কইতো ছড়া কেটে।

কেবল দুজন তাদের জায়গা থেকে নড়লো না। তারা হচ্ছে, সেই টিনের সেপাই আর সেই ছোট্ট মেয়েটি। মেয়েটি ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো তার সেই মোহন ভঙ্গিতে হাত দুটি মেলে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে। আর সেপাইটি দাঁড়িয়ে রইলো একপায়ে আগের মতোই অবিচল ভাবে। এক মুহূর্তের জন্যেও মেয়েটির দিক থেকে চোখ না ফিরিয়ে।

বারোটা বাজলো। খট্! নস্যির বাক্সটার ঢাকনা গেলো খুলে কিন্তু তার মধ্যে নস্যি ছিলো না। তার ভেতর থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলো এক কালো খুদে ভেল্কিবাজ। আসলে সে বাক্সের আটকানো একটা স্প্রিংয়ের পুতুল (Jack-in-the box)। সে বললে, 'টিনের সেপাই! তোমার চোখ দুটো ফিরিয়ে নেবে কি?'

কিন্তু টিনের সেপাই না শোনার ভান করলো।

ভেল্কিবাজ বললো, 'আচ্ছা! কাল অবধি তো থাকো।'

যখন সকাল হলো, ছেলেমেয়েগুলো ঘুম থেকে উঠলো, টিনের সেপাইটিকে রাখা হলো জানালার গোবরাটের ওপর। আর বাতাসেই হোক বা ভেল্কিবাজের গুণেই হোক, হঠাৎ জানালাটা গেলো খুলে। অমনি টিনের সেপাইটি মাথা নিচের দিকে করে তেতলা থেকে পড়তে লাগলো একেবারে মাটিতে।

ভয়ংকর পড়া বলতে হবে। তার একমাত্র পাখানি শূন্যে কেবলই ঘুরতে লাগলো। অবশেষে সে তার সেপাইয়ের টুপিতে ভর দিয়ে ফুটপাথের পাথরের জোড়ে সঙিন ঢুকিয়ে স্থির হয়ে রইলো।

পরিচারিকা ও ছোট ছেলেটি তাঁকে তৎক্ষণাৎ খুঁজতে নেমে এলো কিন্তু তারা তাকে প্রায় পায়ে মাড়িয়ে গেলেও খুঁজে পেলো না। টিনের সেপাইটি যদি তাদের ডেকে বলতো, 'আমি এখানে' তাহলে তাকে দেখতে পেতো। কিন্তু সৈনিকের পোশাক পরে থাকায় সে ভাবলো তা তাকে মানায় না।

শুরু হলো বৃষ্টি। প্রত্যেকটি ফোঁটা আগের চেয়ে ভারি হতে লাগলো। শেষে পড়তে লাগলো ঝমঝম করে। বৃষ্টি থামলে এলো

দুটি ছেলে। একজন বললে, 'ছাখ্। একটা টিনের সেপাই। ও নৌকোয় চড়বে।'

তারা একখানা পুরনো খবরের কাগজ দিয়ে একটা নৌকো তৈরি করে টিনের সেপাইটিকে তার মধ্যে রাখলো। নৌকো চললো ভেসে নর্দমা দিয়ে। দুটো ছেলেই হাততালি দিতে দিতে তার পাশে পাশে ছুটলো। কাগজের নৌকোখানি এ-ধার, ও-ধার দুলতে লাগলো। আর মাঝে মাঝে এমন ঘুরপাক দিতে লাগলো যে, টিনের সেপাইটির মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগলো। তবু সে অবিচল, স্থির—বেয়নেটটা শক্ত করে চেপে ধরে তাকিয়ে রইলো সোজা সামনের দিকে।

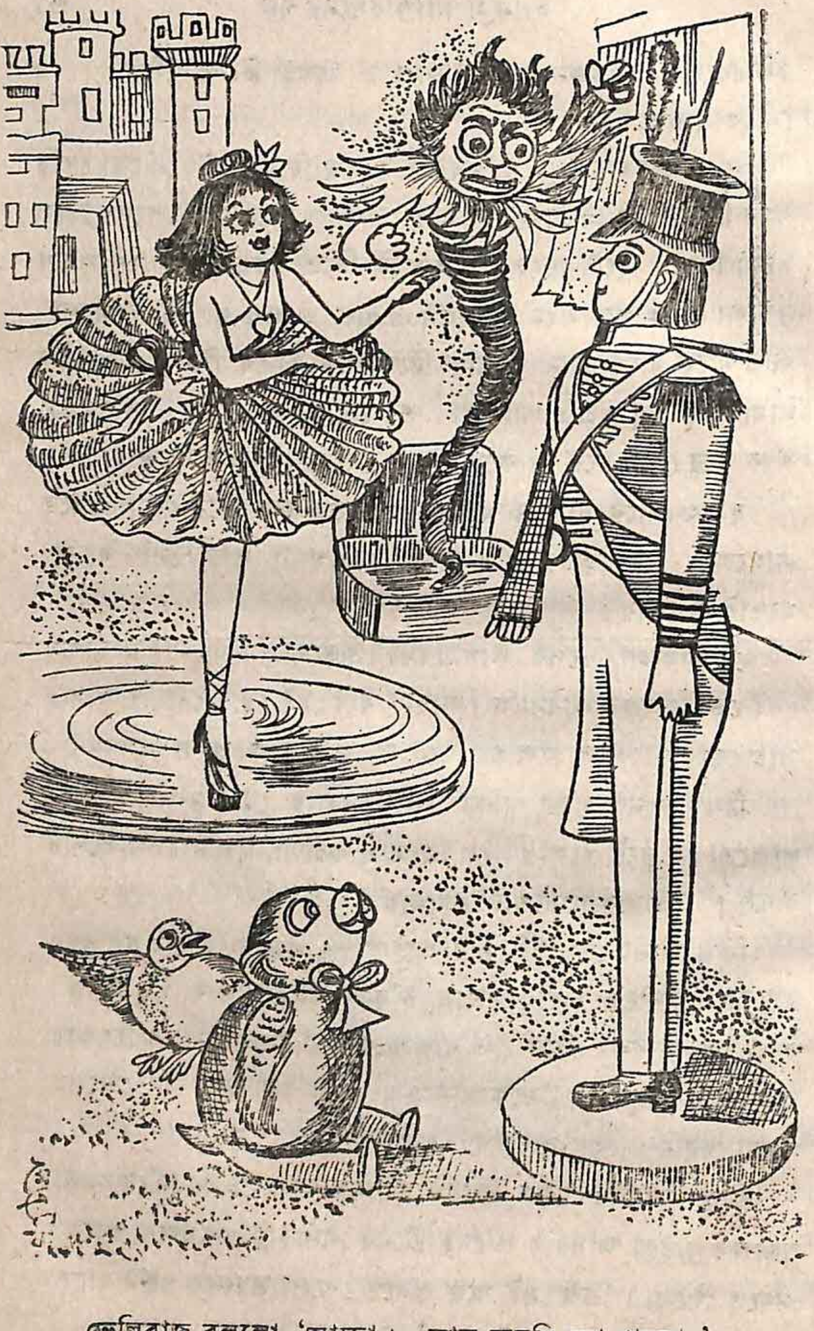
হঠাৎ নৌকোখানা নর্দমা-ঢাকা বোর্ডের তলা দিয়ে ভেসে যেতে লাগলো। সেপাইটির বোধ হলো জায়গাটা তার সেই বাক্সের মতোই অন্ধকার।

সে ভাবলো, এরপর কোথায় গিয়ে পড়বো ? ব্যাপারটা নিশ্চয় সেই ভেল্কিবাজের কারসাজি ! আহা ! যদি সেই ছোট মেয়েটি আমার সঙ্গে ভেসে যেতো তাহলে এর দ্বিগুণ অন্ধকার হলেও গ্রাহ্য করতাম না।

ঠিক তখনই সেই নর্দমা-ঢাকার তলায় যে মস্ত জল-ইঁদুরটা থাকতো সে ছুটে এলো। সে জিগ্যেস করলো, 'তোমার পাসপোর্ট আছে ? তোমার পাসপোর্ট কোথায় ?'

কিন্তু টিনের সেপাইটি তার অস্ত্র আরও শক্ত করে ধরে চুপ করে রইলো। নৌকো চললো ভেসে, ইঁদুরটা চললো তার পিছু পিছু। ও ! সে কী রকম রাগে দাঁত বার করে কাঠি-কুটোগুলোকে চিৎকার করে বলতে লাগলো, 'ওকে থামাও ! ওকে থামাও ! ও টোলের পয়সা দেয়নি ! ওর পাসপোর্ট দেখায়নি।'

কিন্তু স্রোতের বেগ ক্রমেই বাড়তে লাগলো। নৌকোখানা সুড়ঙ্গের বাইরে আসবার আগেই টিনের সেপাইটি এক ঝলক আলো দেখতে পেলো। কিন্তু সেই সঙ্গে শুনতে পেলো ভয়ংকর গর্জন যাতে সব শুনে সাহসীর বুকও কেঁপে ওঠে।



ভেল্কিবাজ বললো, 'আচ্ছা ! কাল অবধি তো থাকো।'

কল্পনা করো। যেখানে নর্দমাটা শেষ হয়েছিলো, সেখানে তার জল খাড়াভাবে পড়ছিলো একটা মস্ত খালে। ব্যাপারটা আমাদের পক্ষে একটা খুব বেগবান জলপ্রপাত দিয়ে নৌকোয় ভাটিতে যাওয়া যেমন বিপজ্জনক, সেই টিনের সেপাইটির পক্ষেও ছিলো তেমনি।

সে জায়গাটার এত কাছে এসে পড়লো যে, আর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। নৌকোখানা সামনের দিকে ছুটে গেলো। বেচারি টিনের সেপাই যতটা জোরে পারলে ততটা জোরে শক্ত কাট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তার চোখের পাতা যে একটুও পড়লো, একথা কেউ বলতে পারবে না। নৌকোখানা তিনবার, না, চারবার ঘুরপাক দিলে, তার কানা ছাপিয়ে উঠলো জল। ডুবে যাবেই। টিনের সেপাইটি গলা অবধি জলে দাঁড়িয়ে রইলো। নৌকোখানা যেতে লাগলো তলিয়ে, কাগজখানা যেতে লাগলো গলে—জল উঠলো টিনের সেপাইটির মাথা ছাপিয়ে; আর, সে ভাবতে লাগলো, সেই সুন্দরী নর্তকীর কথা, যাকে সে আর কোনো দিনই দেখতে পাবে না। তার কানে বাজতে লাগলোএইকথাগুলো ঃ

'সাহসী বিদেশী! তোমার কপালে দুঃসাহসিক অভিযান, মারাত্মক বিপদ আসুক।'

কাগজখানা এখন দুভাগ হয়ে গেল ছিঁড়ে। টিনের সেপাই সেই ফাঁক দিয়ে গেলো পড়ে। কিন্তু তখনই একটা প্রকাণ্ড মাছ তাকে গিলে ফেললো। ওঃ! কী অন্ধকার! সেই নর্দমা-ঢাকার তলার চেয়েও তার অন্ধকার। তার ওপর জায়গাটা সরুও। কিন্তু টিনের সেপাই তেমনি অবিচল, শক্ত। সেখানে সে অস্ত্র কাঁধে নিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে রইলো।

মাছটা ঘুরতে, মোচড় দিতে এবং অদ্ভুত রকমে নড়াচড়া করতে লাগলো। অবশেষে স্থির হলো তার মাঝ দিয়ে যেন বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে গেলো। দিনের আলো ঝলমল করে উঠলো আর কে যেন বলে উঠলো, 'টিনের সেপাই'! মাছটাকে ধরে বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করা হয়। সেখান থেকে রান্নাঘরে এনে চাকরানী

মেয়েটা একখানা মস্ত ছুরি দিয়ে তাকে কুটছিল।

সে টিনের সেপাইয়ের মাঝখানটা দু আঙুলে ধরে বৈঠকখানায় নিয়ে গেলো। সেখানে প্রত্যেকেই সেই আশ্চর্য মানুষটিকে দেখতে উৎসুক হলো। সে মাছের পেটে ঢুকে ভ্রমণ করেছে। যাহোক, আমাদের খুদে লড়ুয়েটি কিন্তু তাতে গর্ব বোধ করলো না। তারা তাকে টেবিলের ওপর রাখলো, আর সেখানে—না, জগতে কেমন করে এমন এক অত্যাশ্চর্য কিছু ঘটতে পারে?—যে ঘরে সে আগে ছিল টিনের সেপাইটি এসেছে ঠিক সেই ঘরে।

সে দেখলো, সেই ছেলে-মেয়েদের, টেবিলের ওপর ছিল সেই খেলনাগুলো, সে সবের মধ্যে ছিল সেই সুন্দর কাসলটি আর তার সামনে সেই সুন্দরী ছোট্ট মেয়েটি। সে তেমনি একখানি পা শূন্যে তুলে একপায়ে তেমনি দাঁড়িয়েছিল। সেও অবিচল। অবস্থাটি টিনের সৈনিকের অন্তর স্পর্শ করলো। তা চোখের জল হয়েবেরিয়েও পড়তে পারতো। কিন্তু এরকম দুর্বলতা সেপাইকে মানায় না। সে মেয়েটির দিকে, মেয়েটি তার দিকে তাকিয়ে রইলো, কিন্তু একজনও একটিও কথা কইলো না।

এখন, ছোট ছেলেগুলোর একজন, টিনের সেপাইটিকে তুলে নিয়ে সোজা ফেলে দিল স্টোভের মধ্যে! কেন সে তা করলো তার কারণ বললে না। কিন্তু নস্যির বাক্সর সেই ভেল্কিবাজটার হাত এতে নিশ্চয় থেকে থাকবে।

টিনের সেপাইটি এবার আগুনের লাল আভার মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলো। তার খুবই গরম বোধ হতে লাগলো! এই উত্তাপ আসলে আগুনের অথবা তার অন্তরে ভালোবাসার কিনা, তা সে জানে না। সে তার গায়ের রং একেবারে হারিয়ে ফেললো। এই রং বদল তার ভ্রমণের সময় বা অন্তরের আবেগে হলো, আমি তা জানি না। সে তাকিয়ে রইলো সেই মেয়েটির দিকে, আর মেয়েটি তাকিয়ে রইলো তার দিকে। সে অনুভব করলো, গলে যাচ্ছে, কিন্তু আগের মতোই

সে অস্ত্র কাঁধে দাঁড়িয়ে রইলো স্থির হয়ে।

একটা দরজা খুলে গেলো, বাতাস নর্তকীটিকে চেপে ধরলো আর সে পরীর মতো সোজা উড়ে গিয়ে পড়লো টিনের সেপাইটির কাছে স্টোভটার মধ্যে। দুটিতে জ্বলে উঠলো এবং মিলিয়ে গেলো। সেপাইটি গলে শক্ত চিমটি হয়ে গেল। চাকরানী পরদিন যখন স্টোভটার ভেতর থেকে ছাইগুলো বার করলো তখন সে তার মধ্যে পেল ছোট্ট টিনের হৃৎপিণ্ডের আকারে সেপাইটির দেহাবশেষ। আর নর্তকীটির ছিল কেবল সোনার পাখাটি ; আর, তাও পুড়ে হয়ে গিয়েছিল কয়লার মতো কালো।

কদাকার হাঁসের ছানা

গ্রীষ্মকাল। গ্রামে সব সুন্দর গমগুলো হলদে হয়েছে, যবগুলো হয়েছে সবুজ, সবুজ মাঠে বিচালিগুলো পাশ করে রাখা হয়েছে আর সারসটি লাল লম্বা পা ফেলে ইঙ্গিতের ভাষায় কথা কইতে কইতে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। ভাষাটা সে শিখেছে তার মায়ের কাছ থেকে। খেতপ্রান্তরগুলোর ধারে ঘন বন এবং মাঝখানে একটি গভীর হ্রদ।

সত্যি, গ্রামে সবই সুন্দর। গভীর খালবেষ্টিত এক পুরোনো প্রাসাদে পড়েছে তপ্ত রোদ। আর, প্রাচীর থেকে নিচে জলের কিনারা অবধি জন্মেছে বড় বড় বারডক্ পাতা, পাতাগুলো এত উঁচু যে, ছেলে-মেয়েরা সেগুলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলেও তাদের দেখা যায় না।

জায়গাটা বনের সবচেয়ে ঘন অংশের মতোই জংলা ও নিরালা। একটি পাতিহাঁস সেখানে বাসা করবার জন্যে বেছে নিয়েছে। সে তার ডিমগুলোর ওপর বসে তা দিচ্ছে। কিন্তু প্রথম দিকে সে আনন্দ বোধ করেছিলো, এখন আনন্দ ছিলো না। কারণ তাকে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হচ্ছে। কেউ তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসে না। অন্য হাঁসেরা বারডক্ পাতার মধ্যে তার সঙ্গে গল্পগুজব করার চেয়ে খালে সাঁতার কাটা পছন্দ করে।

অবশেষে ডিমগুলো ফুটলো, 'চিক্! চিক্!' ডিমগুলোর সবই বেঁচে ছিলো। এক এক করে ছোট ছোট মাথা বার হতে লাগলো। হাঁসটা বললে, 'প্যাঁক, প্যাঁক!' সবগুলো ভালো করে যতখানি পারলো উঠে দাঁড়ালো। তারা সবুজ পাতাগুলোর তলা থেকে এদিক ওদিক উঁকি দিতে লাগলো। সবুজ রং চোখের পক্ষে ভালো বলে তাদের মা যতক্ষণ খুশি তাদের তাকাতে দিলো।

বাচ্চাগুলো বললে, 'জগৎটা কত বড়ো!' তারা যখন ডিমের

খোলার মধ্যে ছিলো, তখনকার সেই অবস্থা থেকে এখানকার অবস্থা কতো তফাৎ!

মা বললে, 'তোমরা কী মনে করছো, গোটা দুনিয়া এই রকম? এটা বাগানের পাঁচিলের ওধারে অনেকদূর পাদ্রির সেই খেত অবধি ছড়ানো। কিন্তু আমি সেখানে কখনো যাইনি। তোমরা সকলে এখানে আছো তো?' তারপর সে উঠে দাঁড়ালো। 'না, তোমাদের সকলকে এখানে দেখছি না। সবচেয়ে বড় ডিমটা এখনও এখানে রয়েছে। কতক্ষণ এ অবস্থা চলবে? এর জন্যে আমি এতো ক্লান্ত!' তারপর সে আবার তার ওপরে বসলো!

তার সঙ্গে দেখা করতে এলো এক বুড়ি হাঁস; বললে, 'কেমন আছো গো?'

মা বললে, 'এই ডিমটা আমাকে এতক্ষণ আটকে রেখেছে! এটা ফুটবে না। কিন্তু অন্যগুলোকে দেখ! আমার জীবনে যে সব হাঁসের ছানা দেখেছি, ওরা হচ্ছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর। ওরা দেখতে হয়েছে ওদের বাবার মতো—সেই অকর্মাটির মতো। সে, আমাকে একবারও দেখতে আসেনি।'

বুড়ি হাঁসটা বললে, 'যে ডিমটা ফুটছে না সেটা দেখাও তো! আমার কথা বিশ্বাস করো, ওটা টার্কির ডিম। আমাকেও একবার এই ভাবে ঠকানো হয়। বাচ্চাগুলোর জন্যে আমাকেও একবার এরকম ভুগতে হয়েছিলো। তারা জলকে ভয় করতো। আমি তাদের ওখানে নিয়েই যেতে পারতাম না। তাদের ডাকতাম, বকতাম, কিন্তু সবই বৃথা হতো। ডিমটা আমায় দেখাও তো—হ্যাঁ! ঠিক! নির্ঘাৎ ওটা টার্কির ডিম। ওটাকে রেখে দিয়ে ছানাগুলোকে সাঁতার কাটতে শেখাও।'

মা-হাঁসটা বললে, 'আরও কিছু সময় এটাতে তা দেবো। এতদিন এখানে এটাতে তা দিচ্ছি যে শস্য কাটার সময়টা আমাকে এখানেই থাকতে হতে পারে।'

'আমার তাতে কী ?' বলে বুড়ি হাঁসটা হেলে-দুলে চলে গেলো।

অবশেষে বড় ডিমটা ফুটলো। ছানাটা 'চিক্! চিক্!' বলে হুমড়ি খেয়ে বেরিয়ে এলো। কিন্তু ও বাবা! কত বড় আর দেখতে কী কদাকার! হাঁসটি তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, 'ওটা মস্ত, গায়েও জোর। অন্যগুলো আদৌ ওর মতো নয়। ওটা মদ্দা টার্কি নাকি ? আচ্ছা, শীগ্‌গিরই তা দেখা যাবে। আমি নিজে ঠেলা দিয়ে ফেললেও ও নিজে থেকে নিশ্চয় জলে নেমে পড়বে।'

পরদিন আবহাওয়া হলো মন-খুশি-করা। হংসী-মা যখন তার ছানাগুলোকে সঙ্গে নিয়ে খালে গেল, তখন সূর্য সবুজ পাতায় তপ্ত রোদ ছড়িয়ে দিয়েছে। হাঁসের মা ঝপ্ করে জলে নেমে পড়লো। সে 'প্যাঁক, প্যাঁক' করে উঠলো। আর ছানাগুলো একে একে ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে। তাদের মাথা জলে ঢেকে গেলো। কিন্তু আবার সকলে ভেসে উঠলো এবং একসঙ্গে সুন্দরভাবে সাঁতার কাটতে লাগলো। বিনা চেষ্টায় তাদের পাগুলো নড়তে লাগলো। সবগুলো, এমন কী সেই ধুসর রঙের কদাকার ছানাটিও ছিলো সেই সঙ্গে।

হাঁসের মা বললে, 'বা! ওটা টার্কি নয়। দেখ, কী সুন্দর পা দোলাচ্ছে, কেমন সিধে হয়ে আছে! ও আমারই ছানা! বেশ ভাল করে ঠাহর করলে দেখা যাবে, ওটা দেখতেও বাস্তবিক খুব সুন্দর। প্যাঁক, প্যাঁক। এখন এস আমার সঙ্গে। তোমাদের দুনিয়ায় নিয়ে যাবো। হাঁস-পাড়ায় সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো, কিন্তু সবাই আমার কাছাকাছি থেকো, কেউ যেন মাড়িয়ে না ফেলে। আর খুব সাবধানে থেকো—বেড়ালে যেন না ধরে!'

তাই তারা এলো হাঁস-পাড়ায়। সেখানে হচ্ছিল, ভয়ংকর গোলমাল। দুটো পরিবার গাংদাড়া মাছের অবশিষ্ট একটা টুকরো নিয়ে ঝগড়া বাধিয়েছিলো। টুকরোটা শেষকালে দখল করলো একটা বেড়াল।

ঠোঁট মুছে ছানাগুলোর মা বললে, 'দেখছে বাছারা। এই হচ্ছে

সংসারের রীতি।' গাংদাড়া ভাজা তারও প্রিয়। 'এখন পা চালাও, একসঙ্গে থাক। ঐখানে যে বুড়ি-হাঁসটাকে দেখছো, ওকে নমস্কার করো। এখানে সব হাঁসের মধ্যে ও বিশিষ্ট। ওর শরীরে স্পেন বংশীয় রক্ত আছে। সেই জন্যেই ও ভারিক্কী আর কেতাদুরস্ত। দেখ, ওর পায়ে রাঙা ন্যাকড়া। ওটাকে মনে করা হয় খুব সুন্দর ; একটা হাঁসের পক্ষে সবচেয়ে উঁচু সম্মান। ভেতর দিকে পায়ে পাতা ঘুরিয়ো না। সুশিক্ষিত হাঁসের ছানা তার বাপ-মায়ের মতো সর্বদা পা ফাঁক করে রাখে। হ্যাঁ, ঠিক ঐ রকম করে—ন্যাখো। এখন গলা নোয়াও আর বলো, 'প্যাঁক।'

তাদের যা বলা বলো, তারা তাই করলো। কিন্তু অন্য যে সব হাঁস উঠোনে ছিলো, তারা তাদের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ঐ ন্যাখ, ঐ আর এক ঝাঁক, এমনিতেই আমরা যেন যথেষ্ট নয়। ছি! ওটা কী রকম কদাকার! ওকে আমরা সহ্য করবো না।' তৎক্ষণাৎ একটা হাঁস তার কাছে উড়ে গোলা এবং গলায় কামড়ে দিলে।

হাঁসের মা বললে, 'ওকে ছেড়ে দাও। ও তো কারো কোনো ক্ষতি করছে না।'

'হ্যাঁ কিন্তু ওটা কতো বড়। আর, দেখতে কী অদ্ভুত! সেই জন্যেই ওকে উত্যক্ত করা হবে।'

পায়ে লাল ন্যাকড়া বাঁধা বুড়ি-হাঁসটা বললে, 'আমাদের ভালো হাঁস-গিন্নীর ছেলে-মেয়েগুলো খাশা, একটি বাদে। ওটা ভালো হয় নি। আমার মনে হয়, ওটাতে আবার তা দিলে হতো।'

হাঁসের মা বললে, 'দেখুন, মাননীয়া, তা আর হতে পারে না। অবিশ্যি ও দেখতে সুন্দর নয়, কিন্তু ছেলে ভালো। অন্যগুলোর মতোই সাঁতার কাটে ; এমন কী, ওদের চেয়ে ভালো মনে হয়, ও পরে আর সবগুলোর মতোই বড়ো হবে, হয়তো তখন আরও ছোটো দেখাবে। ও অনেকদিন খোলার মধ্যে ছিলো। আলাদা দেখতে হবার কারণ তাই।' এবং সে ছানাটির গলা চুলকে দিলে ; তার শরীরে ঠোঁট

বুলিয়ে দিলে। আরও ববলে, 'তা ছাড়া ও হচ্ছে পুরুষ। ওর গায়ে খুব জোর হবে। সেইজন্যে ওতে বিশেষ কিছু এসে যায় না। কারণ, ওকে লড়াই করে এগোতে হবে তো।'

বুড়ি-হাঁস বললে, 'অন্য হাঁসগুলো খুব সুন্দর। সব আপনার মতো করে নাও, মিল-মিশে থাকো বাছা। যদি একটা বানমাছের মাথা পাও আমার কাছে আনতে পারো।'

তাই তারা মিলে-মিশে ; পাশাপাশি রইলো।

ঝিন্তু বেচারী খুদে ছানাটি, যে সকলের শেষে ডিম থেকে বেরিয়েছিলো, এবং দেখতে কদাকার, মেয়ে আর পুরুষ হাঁসগুলো তাকে কামড়াতে, ঠোকরাতে ও উত্যক্ত করতে লাগলো।

তারা সকলেই বলতে লাগলো, 'এটা কত বড় !'

আর যে পুরুষ-টার্কিটা পায়ে রেকাব নিয়ে জন্মে নিজেকে মনে করতো সম্রাট। সে রাগে লাল হয়ে পাল তোলা জাহাজের মতো তার দিকে ছুটে এলো ! বেচারী বুঝে উঠতে পারলো না, সে কী করবে। সে একেবারে বিব্রত হলো। কারণ সে এমন কদাকার যে, সমস্ত হাঁস-মুরগী পালন খোঁয়াড়ের উপহাসের পাত্র।

এইভাবে কাটলো প্রথম দিন। অবস্থাটা ক্রমেই খুব খারাপ হতে লাগলো। বেচারী কদাকার সেই হাঁসের ছানাটাকে সকলেই অবজ্ঞা করে। এমন কী তার ভাই-বোনেরাও তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে লাগলো ; বললে, 'নোংরাটা তোকে বেড়ালে ধরুক।'

মা বললে, 'তুই যদি এখান থেকে অনেক দূরে কোথাও চলে যেতিস্ !'

হাঁসেরা তাকে কামড়াতে লাগলো, মুরগীগুলো তাকে ঠোকরাতে লাগলো। আর, যে মেয়েটা হাঁস-মুরগী টার্কিগুলোকে খেতে দিতো সে তাকে লাথি মারতে লাগলো।

সে বেড়া ডিঙিয়ে ছুটলো। তাতে ঝোপের মধ্যেকার ছোট পাখিগুলো ভয় পেয়ে গেলো। চোখ বন্ধ করে ছুটতে ছুটতে হাঁসের

ছানাটা ভাবলো, 'আমি এমন বিশ্রী দেখতে বলে, ওরা ভয় পেয়েছে।'

অবশেষে সে এসে পড়লো, জলা ও ঘাস-জঙ্গলে ঢাকা চওড়া এক পতিত জমিতে। সেখানে বাস করতো গোটা কয়েক বুনো হাঁস। সে ক্লান্ত হয়ে সেখানে শুয়ে সারা রাত কাটিয়ে দিলে।

সকালে বুনো হাঁসগুলো উড়লো এবং তাদের নতুন সঙ্গীর কথা জানতে পারলো। তারা তাকে জিগ্যেস করলে, 'তুমি কে ?' আমাদের সেই ছোট্ট হাঁসের ছানাটি ঘুরপাক দিয়ে যতদূর সম্ভব বিনয়ের সঙ্গে তাদের সম্ভাষণ জানালো।

বুনো হাঁসগুলো বললে, 'বাস্তবিকই তোমাকে বিশ্রী দেখতে। যাহোক তাতে কিছু যায়-আসে না, যদি তুমি আমাদের বংশে বিয়ে না করো।'

বেচারী! বিয়ের কথা সে কখনো ভাবেই নি : সে কেবল প্রার্থনা করে, সেই নল-খাগড়া-বনে শুয়ে থাকতে আর জলাটির জল খেতে।

সেখানে সে শুয়ে রইলো পুরো দুটো দিন। তৃতীয় দিনে এলো একজোড়া বুনো মেয়ে হাঁস এবং পুরুষ হাঁস। তারা বেশিদিন ডিম থেকে বেরোয় নি ; তাদের বেয়াদপির কারণও তাই।

তারা বললে, 'ওহে শুনছো! তুমি এমন কদাকার যে, সেই কারণেই আমরা তোমাকে খুব পছন্দ করি। তুমি আমাদের সঙ্গে আসবে কী ? আমাদের মতো ভবঘুরে পাখি হবে ? এখান থেকে বেশিদূরে নয়, আর এক জলায়, কতকগুলো মিষ্টি বুনো মাদি হাঁস আছে। তারা দেখতে যেমন মনোরম, তেমনি 'হিস্‌হিস্‌'! তুমি দেখতে কদাকার বলে, তাদের কাছে গেলে বাস্তবিকই তোমার কপাল ফিরবে।

হঠাৎ দুম করে বন্দুকের শব্দ হলো, আর বুনো হাঁস দুটো নলখাগড়া বনে মরে কাঠ হয়ে পড়লো। রক্তে জল লাল হয়ে গেলো আবার বন্দুকের শব্দ হলো—দুম্‌ ' নল-খাগড়া বন থেকে বুনো হাঁসের সমস্ত ঝাঁকটাই আকাশে উড়লো। আবার বন্দুকের শব্দ হলো।

মস্ত একদল শিকারী এসেছিলো। তারা লুকিয়ে ছিলো চারধারে। কেউ কেউ গাছে চড়েছিলো। গাছগুলোর মস্ত মস্ত ডালগুলো জলাটার ওপর অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিলো। ঘন গাছগুলোর মাঝ থেকে নীল ধোঁয়া উঠে জলে পড়ে মিলিয়ে যাচ্ছিল। শিকারী কুকুরগুলো জল-কাদায় ছপ্‌ ছপ্‌ করে ছুটছে। নল-খাগড়া আর পটপটিগুলো এদিক ওদিক নুয়ে পড়ছে।

বেচারী খুদে হাঁসটা কী রকম ভয় পেয়ে গেলো। তার ডানার মধ্যে লুকোবার জন্যে সে মাথাটা ঘোরালো। মুহূর্তের মধ্যে ভয়ংকর দেখতে একটা কুকুর তার একেবারে কাছে এসে দাঁড়ালো—তার মুখ থেকে লকলকে জিভ বেরিয়ে পড়ছে, চোখ দুটো ভয়ংকর জ্বলছে। বিশ্রী সেই হাঁসের ছানাটিকে দেখে সে লম্বা চোয়াল জোড়া মেললো; তার চোখা চোখা দাঁতগুলো দেখিয়ে ছপ্‌ ছপ্‌ করে চলে গেল, তার কোনো ক্ষতি না করেই।

'নিজেকে ধন্যবাদ! আমি এমন কদাকার যে কুকুরও আমাকে খাবে না।' বলে সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো।

যদিও শিকার চলতে থাকলো, গুলির পর গুলি ছুটতে লাগলো, সে শুয়ে রইলো স্থির হয়ে।

সন্ধ্যা পর্যন্ত সেই হট্টগোল চললো; এমন কি, তখনও সেই খুদে বেচারীটি নড়তে সাহস করলো না। চারধারে তাকিয়ে দেখবার আগে সে ঘণ্টা কয়েক অপেক্ষা করলো। তারপর জলা জায়গাটা থেকে যত জোরে পারলো সরে পড়লো। এত জোরে বাতাস বইছিলো যে তার চলতে কষ্ট হলেও সে খেত ও মাঠের ওপর দিয়ে ছুটলো।

সন্ধ্যার দিকে সে পৌঁছলো একটা ভাঙা-চোরা ছোট কুঁড়েঘরে। কুঁড়েখানা ছিল এমন ভাঙা-চোরা যে, সে বুঝতেই পারছিলোনা,কোন দিকে পড়বে, তাই দাঁড়িয়ে ছিলো। এমন ভীষণ জোরে বাতাস বইছিল যে, খুদে ছানাটি নিজেকে সামলাতে লেজে ভর দিতে বাধ্য হলো, কিন্তু অবস্থাটা ক্রমেই খুব খারাপ হয়েআসতেলাগলো। এমন

সময়ে সে দেখলো, দরজাটার একখানা কজা নেই এবং পাল্লাখানা এমনভাবে বেঁকে আছে যে, সে সেই ফাঁকে গলে ঘরে ঢুকতে পারে। সে ঘরে ঢুকলো।

এই ঘরে থাকতো এক বুড়ি, তার হুলো বেড়ালটা আর তার মুরগীটা নিয়ে। বুড়ি বেড়ালটাকে বলতো তার 'খুদেছেলে'। বেড়ালটা জানতো কেমন করে পিঠ ফুলিয়ে ঘড় ঘড় শব্দ করতে হয়। আবার উল্টো দিকে হাত বুলোলে ফুলকি ছড়াতেও জানতো। মুরগীটার পা দুখানা ছিল ছোটো। তাই বুড়ি তাকে ডাকতো 'খুদে-ঠ্যাং কোকিল' বলে! সে খুব ভালো ডিম পাড়তো। বুড়ি তাকে ভালবাসতো নিজের সন্তানের মতো।

পরদিন সকালে নতুন অতিথির বিষয় জানা গেলো। হুলো বেড়ালটা মিউ মিউ আর মুরগীটা 'কোঁক্ কোঁক্' করতে লাগলো।

বুড়ি চারধারে তাকিয়ে জিগ্যেস করলে, 'কী ব্যাপার? যাহোক বুড়ি চোখে ভালো দেখতে পেতো না; হাঁসের ছানাটাকে মনে করলে বেশ মোটা-সোটা হাঁস—পথ ভুলে এসে পড়েছে। বুড়ি বললে, 'খাশা শিকার পাওয়া গেছে।'

'যদি ওটা মদ্দা না হয়, এবার আমিও পাবো হাঁসের ডিম। চেষ্টা করে দেখা যাক।'

তাই তাকে দিয়ে তিন সপ্তাহ পরীক্ষা করা হলো। কিন্তু কোনো ডিমই পাওয়া গেলো না!

এখন, হুলোটা ছিলো বাড়ির কর্তা, আর মুরগীটা ছিল বাড়ির গিন্নী। তারা সর্বদা বলতো 'আমরা আর এক জগৎ'। কারণ তারা নিজেদের মনে করতো অর্ধেক জগৎ। কেবল তাই নয়—ভালো অর্ধেক! হাঁসের ছানাটা মনে করলো, অন্য রকমেরও হতে পারে, কিন্তু মুরগীটা তাতে সায় দিল না।

সে জিগ্যেস করলো, 'তুমি ডিম পাড়তে পারো?'

'না।'

'তাহলে চপ করে থাকো।'

আর হুলোটা বললে, 'পিঠ ফোলাতে পারো? ঘড়্ ঘড়্ শব্দ করতে পারো?'

'না।'

'তাহলে বিজ্ঞেরা যখন কথা বলছে তখন কিছুই বলা উচিত নয়?'

তাই হাঁসের ছানাটি একটি কোণে বসে রইলো। তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো। যাহোক সে খোলা বাতাস ও উজ্বল রোদের কথা ভাবতে লাগলো। আর এই চিন্তাগুলো তার মনে আবার সাঁতার কাটার ইচ্ছা এমন প্রবল করে তুললো যে, মুরগীটাকে তা না বলে থাকতে পারলো না।

মুরগীটা বললে, 'তোমার কিসের কষ্ট? তোমায় কিছুই করতে হয় না। আর তাই ঐসব আবোল-তাবোল ভাবছো। হয় ডিম পাড়ো, নয় ঘড়্ ঘড়্ করো। বাকী সব ভুলে যাবে।'

হাঁসের ছানাটা বললে, 'কিন্তু সাঁতার কাটতে এমন চমৎকার লাগে! যখন জল তোমার মাথা ডুবিয়ে দেয়, আর তুমি তলিয়ে যাও তখন কী মজা যে লাগে!'

মুরগীটা বললে, ওটা অদ্ভুত ধরনের আনন্দ। মনে হয়, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। আমার কথা ছেড়ে দিচ্ছি, হুলোটাকে জিগ্যেস করো···আমি যতোটা জানি ও সবচেয়ে বিজ্ঞ প্রাণী—ও সাঁতার বা জলের তলায় ডুব দিতে পছন্দ করে কিনা! তোমার কর্ত্রী, ঐ বুড়িকে জিগ্যেস কর—জগতে ওঁর চেয়ে জ্ঞানী কেউ নেই—তুমি মনে করো, সাঁতার কাটলে ওঁর আনন্দ হয়—অথবা জলে মাথা ডুবে গেলে উনি খুশি হবেন?'

হাঁসের ছানাটা বললে, 'তুমি আমার কথা বুঝছো না।'

'কী! আমরা তোমার কথা বুঝি না! আমরা কথা বলতে চাই না, তুমি নিজেকে বুড়ি আর হুলোটার চেয়ে বিজ্ঞ মনে করো? ওরকমের কিছু ভেবো না, খোকা! তোমাকে যে দয়াদাক্ষিণ্য দেখানো

হয়েছে তার জন্যে কৃতজ্ঞ থাকবে। তোমাকে কী একখানা গরম ঘরে থাকতে দেওয়া হয়নি ? আর সমাজে মেলামেশা করার সুযোগ কী তোমরা নেই—যাদের কাছ থেকে তুমি কিছু শিখতে পারো ? কিন্তু তুমি বোকা ! তোমার সঙ্গে কাজ-কর্ম করা ক্লান্তিকর। বিশ্বাস করো, আমি তোমার ভালো চাই। আমি তোমায় অপ্রিয় সত্য বলছি ; কিন্তু এইভাবেই আসল বন্ধুত্ব দেখানো হয়। এস, একটি বারের মতো ডিম পাড়তে বা ঘড়্ ঘড়্ শব্দ করা শিখতে চেষ্টা করো।'

হাঁসের ছানাটা বললে, 'মনে করছি, বিশাল জগতে আবার বেরিয়ে পড়বো।'

মুরগীটা জবাব দিলে, 'হাঁ যাও।'

তার হাঁসের ছানাটা চলে গেলো। সে জলের ওপর সাঁতার কাটলো, তলায় ডুব দিলে, সে কদাকার বলে, সকল প্রাণী তাকে এড়িয়ে গেলো।

শরৎ এলো। গাছের পাতাগুলো হলদে ও বাদামি হয়ে গেলো। বাতাস সেগুলিকে ধরে চারধারে নাড়াতে লাগলো। বাতাস কনকনে ঠাণ্ডা। শিলা বা তুষারে মেঘ ভারী হয়ে এলো। আর, বেড়ার ওপর বসে দাঁড়কাক ডাকতে লাগলো, 'কট্ কট্, কটর্-কঃ।' বেচারা হাঁসের ছানাটি অবশ্য খুব আরাম বোধ করলো না।

একদিন বেলা শেষে যখন সূর্য অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতায় অস্ত যাচ্ছিল তখন ঝাউবন থেকে উড়লো একঝাঁক বড় ও সুন্দর পাখি, হাঁসের ছানাটি আগে কোনোদিন এতো সুন্দর কিছু দেখেনি। তাদের পালক ঝকঝকে শাদা, গলা লম্বা সরু। সেগুলি ছিলো রাজহাঁস। তারা অদ্ভুত ভাবে ডেকে উঠলো। আর তাদের লম্বা চমৎকার ডানা মেলে এই হিমাচল থেকে খোলা সমুদ্রের পাশ দিয়ে উড়ে চললো গরম দেশে। তারা কতো ওপর দিয়ে উড়ে যেতে লাগলো ! কদাকার হাঁসের ছানাটির মন কেমন যেন করতে লাগলে। সে যাঁতা-কলের চাকার মতো জলে ঘুরপাক খেতে লাগলো। তাদের

দেখবার জন্য গলা টান করে দিলে এবং এমন জোরে ও অদ্ভুত ভাবে ডেকে উঠলো যে, নিজেই ভয় পেয়ে গেলো।

আহা! সে তাদের, সেই সুন্দর পাখিগুলোকে ভুলতে পারলো না। সে যখন তাদের আর দেখতে পেলো না তখন জলে ডুব দিলে এবং যখন আবার উঠলো তখন খুবই উত্তেজিত। হাঁসের ছানাটি জানে না, পাখিগুলোর কী নাম। জানে না, তারা কোথায় উড়ে চলেছে। তবু তাদের ভালোবাসলো। এমন ভাবে আর কখনো কোনো কিছুকে সে ভালোবাসেনি। তাদের হিংসা করলো না, তার মনেও হলো না যে, তাদের মতো রূপ তারও যেন হয়। সেই পাতি হাঁস-পাড়াতে হাঁসগুলো তার সঙ্গে মিশলেই সে খুব সন্তুষ্ট থাকতো।...

আর, শীতটা হলো এমন ঠাণ্ডা! এত ঠাণ্ডা! জল যাতে জমে না যায় সেজন্য সে জলে অবিরাম ঘুরতে লাগলো। কিন্তু প্রতি রাত্রে যে ফাঁকটুকুতে সে সাঁতার কাটতো তা ক্রমে আরও ছোট হতে লাগলো। সেটা এমন জমে গেল যে বরফের কট্ কট্ শব্দ হতে লাগলো।

জলটা যাতে সম্পূর্ণ জমে না যায় সেজন্যে হাঁসের ছানাটা পা দুখানা দিয়ে ঠেলা দিতে বাধ্য হলো। অবশেষে সে বরফের মধ্যে ক্লান্ত অসাড় হয়ে পড়ে রইলো।

পরদিন খুব সকালে এক চাষী সেখান দিয়ে যাবার সময় তাকে দেখতে পেয়ে তার কাঠের জুতো দিয়ে বরফটা খুঁড়ে টুকরো টুকরো করে তাকে বাড়িতে তার স্ত্রীর কাছে নিয়ে এলো।

তার ফলে সে সুস্থ হয়ে উঠলো। বাড়ির ছেলে-মেয়েগুলো তার সঙ্গে খেলা করতে লাগলো; কিন্তু ছানাটি মনে করলো তারা তাকে উত্যক্ত করতে চায়। তাই ভয়ে দুধের হাঁড়ির মধ্যে লাফিয়ে পড়লো, আর ঘরের চারধারে দুধ গেলো ছিটকে। স্ত্রীলোকটি সরু গলায় চিৎকার করে হাততালি দিলে। সেখান থেকে ছানাটা উড়ে পড়লো প্যানের মধ্যে। সেখান থেকে পড়লো ময়দার পিপেয়। তারপর

আবার এলো বেরিয়ে। তাকে দেখাতে লাগলো কী অদ্ভুত।

স্ত্রীলোকটি সরু গলায় চিৎকার করতে করতে তাকে চিমটে দিয়ে মারলো। ছেলে-মেয়েগুলো তাকে ধরতে হাততালি দিয়ে চিৎকার করে পরস্পরের সঙ্গে দৌড়ের পাল্লা লাগিয়ে দিলো। তারপরে ভালো বলতে হবে যে, দরজাটা খোলা ছিলো। সে লাফ দিয়ে সদ্য পড়া তুষারে ঢাকা ঝোপে গিয়ে পড়ে সেখানে শুয়ে রইলো—যেন স্বপ্ন দেখছে।

কিন্তু সেই শীতের প্রখরতায় সে অত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে বাধ্য হলো। সে-সব বর্ণনা বড় বেদনার।

যখন সে একটা ঘাস-জঙ্গল ভরা জলার নল-খাগড়া বনে শুয়ে ছিলো তখন সূর্য সোনার তপ্ত রোদ ছড়াচ্ছে। ভরত পাখিরা আবার গান গাইছিলো। মধুর বসন্তকাল আবার এসেছে ফিরে।

আবার একবার সে ডানা বাঁকালো। সেগুলো আগের চেয়েসবল হয়েছে ; তাকে সামনের দিকে তাড়াতাড়ি নিয়ে গেল। এবং অবস্থাটা ভালো করে বোঝবার আগেই সে মস্ত এক বাগানে এসে পড়লো। বাগানের আপেল গাছগুলো ফুলে ভরে উঠছিলো, ফুলগুলোর সুগন্ধে বাগান ভরে গিয়েছে। তাদের সবুজ ডালগুলো আঁকা-বাঁকা ডালের ওপর ঝুলে পড়ছে। আহা! সব কিছুই এমন মনোরম! বসন্তের নবীনতায় ভরা!

ঝোপের মাঝে থেকে বেরিয়ে এলো তিনটি সুন্দর সাদা রাজহাঁস তারা পালকগুলো মেললো, হালকাভাবে সাঁতার দিতে লাগলো। হাঁসের ছানাটি সেই জমকালো প্রাণী ক'টিকে চেনে। তার মন ভরে গেল এক অজানা বেদনায়!

সে বললে, 'ঐ রাজকীয় পাখিগুলোর কাছে উড়ে যাবো। ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। কারণ, আমি কদাকার! কদাকার আমি ওদের কাছে যাবার কথা ভেবেছি। কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না। হাঁসেদের কামড় মুরগীগুলোর ঠোকর। আর যে মেয়েটা হাঁস-

মুরগীগুলোকে খেতে দিত, তার লাথি খাওয়ার চেয়ে, শীতে কষ্ট পাওয়ার চেয়ে ঐ পাখিগুলোর কামড় খেয়ে মরা ভালো।'

সে উড়ে জলে পড়ে সেই সুন্দর প্রাণী কটির কাছে সাঁতরে গেলো। তারা তাকে দেখেই তার দিকে সাঁতরে এলো।

বেচারী মৃত্যুর প্রতীক্ষায় মাথা নুইয়ে বললে, 'আমায় মেরে ফেলো?'

কিন্তু জলের বুকে সে কী দেখলো? তার নিচে সে দেখলো তার নিজের আকৃতি—আর সেই মোটা, কদাকার ধূসর পাখি নয়—একটি রাজহাঁস।

যদি রাজহাঁসের ডিম ফেটে বার হয় তাহলে সত্যি হাঁস-পাড়ায় জন্মালেও কিছুই এসে যায় না। সেই চমৎকার পাখিটি যে সব দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছে তাতে নিজেকে উন্নত মনে করলো। এখন সে ঠিকভাবে তার সুখের পরিমাপ করতে পারছে। তার চেয়ে বড় রাজহাঁসগুলো সাঁতার কেটে এসে তার গায়ে ঠোঁট বুলিয়ে দিতে লাগলো।

কয়েকটা ছেলে-মেয়ে বাগানে ছুটোছুটি করছিলো। তারা জলে শস্য ও রুটি ছুঁড়ে ফেললো সব চেয়ে ছোটটি বলে উঠলো, 'নতুন একটা এসেছে।'

আর অন্য সকলে বললে, 'একটা নতুন রাজহাঁস এসেছে।'

তারা তাদের মা-বাবার কাছে ছুটে গেলো। জলে কেক ও রুটি ফেলা হতে লাগলো। প্রত্যেকেই বললে, 'নতুনটাই সবচেয়ে ভালো; এতো ছোটো আর এমন সুন্দর!'

বুড়ো রাজহাঁসগুলো তার সামনে মাথা নোয়ালো।

ছোটো রাজহাঁসটা খুব লজ্জা বোধ করলো; ডানার মধ্যে মাথা লুকোলো। সে বুঝতেই পারলো না, কী করবে। সে খুব সুখী, তবু গর্বিত হলো না—কারণ যার অন্তর ভালো সে কখনো গর্ব করে না।

তার মনে পড়লো, কীভাবে সে নির্যাতিত ও উপহাসিত হয়েছে। এখন সে শুনছে, সমস্ত সুন্দর পাখিগুলোর মধ্যে সে সুন্দর!

ফুলগাছগুলো জলে তার ওপর ডালগুলো নুইয়ে দিলে, সূর্য তপ্ত উজ্জ্বল রোদ লাগলো।

আর সে অন্তর-ভরা আনন্দে বলে উঠলো, 'যখন আমাকে কদাকার হাঁসের ছানা বলে অবজ্ঞা করা হতো তখন এতখানি সুখের কথা কী ভাবতে পেরেছি!'

চক্‌মকির বাক্স

বড় রাস্তা দিয়ে একজন সৈনিক চলেছে রাইট-লেফ্‌ট রাইট-লেফ্‌ট। তার কাঁধে ঝোলা, কোমরে তলোয়ার। সে যুদ্ধে গিয়েছিলো ; এখন বাড়ি ফিরছে। পথে দেখা হলো এক ডাইনী বুড়ির সঙ্গে ; তাকে দেখতে ভয়ংকর। তার নিচের ঠোঁট প্রায় গলা অবধি ঝুলে পড়েছিলো।

বুড়ি বললে, 'শুভ-সন্ধ্যা, সৈনিক। তোমার তলোয়ারখানা কী রকম ঝকঝকে আর খাপটা কতো বড়ো! তোমাকে একটা কথা বলছি। তুমি যত ইচ্ছে টাকা পাবে।'

সৈনিকটি বলে উঠলো, 'ধন্যবাদ, ডাইনী-বুড়ি।'

পথের পাশে, কাছেই একটা গাছ দেখিয়ে বুড়ি বললে, 'ঐ বড় গাছটা দেখছো ? ওর ভেতরটা একেবারে ফাঁপা। ওটার আগায় উঠলে তোমার গলে যাবার মতো একটা বড় গর্ত দেখতে পাবে। ঐ পথে ওর তলায় গিয়ে পৌছোবে। আমি তোমার কোমরে একগাছি দড়ি বেঁধে দেবো যাতে তুমি আমায় ডাকলেই তোমায় আবার ওপরে টেনে তুলতে পারি।'

সৈনিকটি জিগ্যেস করলে, 'কিন্তু গাছটার মধ্যে নেমে আমায় কী করতে হবে ?'

ডাইনীটি বললে 'তোমায় কী করতে হবে ? কেন, টাকা আনবে। ওর তলায় পৌছলেই দেখবে একটা চওড়া পথে গিয়ে পড়েছো। সেখানে খুব আলো, শ'রও বেশি বাতি জ্বলছে। তারপর তিনটি দরজা দেখতে পাবে। দরজাগুলো তুমি খুলতে পারো—তালাতে চাবি লাগানোই আছে।

'প্রথম দরজাটা খুললে, একখানা ঘরে ঢুকবে। ঘরের মাঝখানে মেঝেয় রয়েছে মস্ত একটা সিন্দুক। তার ওপর বসে আছে একটা কুকুর। তার চোখ দুটো চায়ের পেয়ালার মতো বড়। কিন্তু তাতে তোমার কিছু যায়-আসে না, ঘাবড়ে যেও না। তোমাকে আমার নীল অ্যাপ্রনখানা ধার দেবো। এখানা মেঝেয় পেতে চটপট্ গিয়ে কুকুরটাকে ধরে এর ওপর বসিয়ে দিও। সেটা করার পরে তুমি সিন্দুকটা খুলতে পার। তার ভেতর থেকে যত খুশি টাকা বার করে নিতে পারবে।

'সেই সিন্দুকে তামার মুদ্রা ছাড়া আর কিছু নেই, কিন্তু তুমি যদি রূপো আরও ভালবাসো, তোমাকে কেবল যেতে হবে পরের ঘরে। সেখানে যাঁতা-কলের চাকার মতো বড় চোখওয়ালা একটা কুকুর দেখতে পাবে। কিন্তু তাকে ভয় করো না। তাকে কেবল আমার অ্যাপ্রনখনির ওপর বসিয়ে দিতে হবে ; তারপর তোমার খুশিমতো সিন্দুকটা লুঠ করো।

'কিন্তু তুমি যদি তামা বা রূপোর বদলে সোনা নিতে চাও, তাও পাওয়া যাবে, যতোটা বইতে পারবে ততটা—তাহলে তোমায় ঢুকতে হবে তৃতীয় ঘরে! যে কুকুরটা টাকার সিন্দুকের ওপর বসে আছে, তার দুটো চোখ। চোখ দুটো গোল টাওয়ারের মতো বড়ো। কল্পনা করতে পারছো সে এক বিখ্যাত জন্তু। কিন্তু ভয় পেও না ; তাকে আমার অ্যাপ্রনের ওপর বসিয়ে দিও। তাহলে সে তোমার কোনো ক্ষতি করবে না। তুমি যতো খুশি সোনার ধন-দৌলত নিতে পারবে।'

সৈনিকটি বললে, 'মন্দ ফন্দি নয়। কিন্তু বুড়ি, তোমাকে সেই টাকার কতোটা দিতে হবে? মনে হচ্ছে, তুমি চাইবে এই লুঠের তোমার পুরো অংশ।'

ডাইনি বললে, 'এক আধলাও নয়। কেবল তোমাকে আমায় এনে দিতে হবে একটা পুরনো চকমকির বাক্স। সেটা আমার দিদিমা গতবারে ওর মধ্যে যখন নেমেছিলেন তখন ভুলে ফেলে এসেছেন।'

সৈনিকটি বললে, 'আচ্ছা, আমাকে কোমরে বাঁধবার দড়ি গাছটা দাও, এখনই যাবো।'

বুড়ি বললে, 'এই নাও দড়ি আর এই আমার অ্যাপ্রন।'

সৈনিকটি তখন গাছটায় উঠলো, গুঁড়ির ফোঁপর দিয়ে তলায় নামলো আর বুড়ি যেমন বলেছিলো, হঠাৎ শত শত বাতিরআলোয় আলোকিত একটা পথে এসে পড়লো।

সে দরজাটা খুলে ফেললো। বাহবা! দেখলো চায়ের পেয়ালার মতো চোখওয়ালা কুকুরটা তার দিকে খুব অবাক হয়ে তাকিয়ে বসে আছে।

অ্যাপ্রনখানা মেঝেয় বিছিয়ে দিয়ে কুকুরটাকে তুলে তার ওপর বসিয়ে দিতে দিতে সৈনিকটি বললে, 'খাশা জন্তু!' তারপর সিন্দুকের পয়সায় পকেট ভর্তি করে ডালাটা বন্ধ করলো; কুকুরটাকে আবার তার আগের জায়গায় বসিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় ঘরে ঢুকলো।

আরে ও কী? ঐ যে বসে আছে যাঁতা-কলের চাকার মতো মস্ত চোখওয়ালা কুকুরটা। সৈনিকটি টিপ্পনী কাটলে, 'ওভাবে আমার দিকে তোমার না তাকানোই ভালো। তাতে চোখ খারাপ হয়ে যাবে। সে কুকুরটাকে ডাইনীর অ্যাপ্রনের ওপর বসিয়ে দিলে।

কিন্তু যখন সিন্দুকটার ডালা খুলে তার ভেতরের চাঁদির টাকা-গুলো দেখতো পেলো তখন বিরক্তির সঙ্গে সব তামার পয়সাগুলো ছুঁড়ে ফেলেই খাঁটি চাঁদি দিয়ে পকেট ও থলে ভর্তি করে নিল।

সে গেলো তৃতীয় ঘরে। এবার হলো এক ভয়ানক অবস্থা। এই ঘরে যে কুকুরটা ছিলো তার চোখ দুটো ছিলো টাওয়ারের মতো মস্ত। আর, সে দুটো তার মাথায় চাকার মতো অবিরাম ঘুরছিলো।

সৈনিকটি বললে, 'শুভ-সন্ধ্যা'। এবং স-সম্মানে মাথা থেকে টুপি তুললো। কারণ, এমন জন্তু সে জীবনে কখনো দেখেনি বা তার কথা শোনেওনি।

তার দিকে তাকিয়ে সে দু-এক মিনিট স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

তারপর যত শীঘ্র কাজটা শেষ করা যায় ততই ভালো—এই ভেবে সে সেই মস্ত জন্তুটাকে ধরে সিন্দুকের ওপর থেকে সরিয়ে ডালাটা তুললো।

ও! তার মধ্যে সে কী সোনার বাহার! কেবল গোটা কোপেনহেগেন শহরটাই নয়, পৃথিবীতে যতোকেক, মিছরি, টিনের সেপাইগুলো চাবুক, ঘোড়ার দোলা আছে সব কেনবার পক্ষে যথেষ্ট। হ্যাঁ, এখন সে সন্তুষ্ট হবে।

সৈনিকটি যত চাঁদির টাকা দিয়ে পকেট আর থলি ভর্তি করেছিলো, সব তাড়াতাড়ি ছুড়ে ফেলে দিয়ে সেগুলোর বদলে নিলে সোনা। কেবল যে পকেট আর থলেতেই নিলে, তা নয়, তার টুপি ও বুটজুতোর মধ্যেও নিলে ঠেসে। ঝকঝকে সোনা! ভারি সোনা! সোনার ভারে তার হাঁটা কঠিন হলো। সে কুকুরটাকে আবার সিন্দুকের ওপর বসিয়ে দিয়ে দরজাটা সজোরে বন্ধ করে গাছটার ফোপরের ভেতর থেকে বললে, 'ডাইনী বুড়ি! আমায় টেনে তোল।'

ডাইনী জিজ্ঞেস করলে, 'চকমকির বাক্সটা পেয়েছো কী?'

একেবারে ভুলে গেছি—সৈনিকটি চিৎকার করে বলে সেটা আনতে ফিরে গেলো। সে ফিরে এলে ডাইনী তাকে গাছের ফোঁপর থেকে টেনে তুললো। সৈনিকটি আবার এসে দাঁড়ালো বড়ো রাস্তাটার ওপর। তার পকেট, থলে, বুটজোড়া ও টুপি সোনায় ঠাসা।

সৈনিকটি জিগ্যেস করলে, 'বলো দেখি, চকমকির বাক্সটা নিয়ে কী করতে যাচ্ছো?

ডাইনী বললে, 'সেটা তোমার ব্যাপার নয়। তুমি টাকা পেয়েছো; এই মুহূর্তে আমার চকমকির বাক্সটা আমায় দাও।'

সৈনিকটি বললে, 'বেছে নাও। হয় এখনই বল, চকমকিরবাক্সটা কেন চাও, অথবা, আমি তলোয়ার বার করে তোমার মাথা কেটে ফেলবো।'

বুড়ি চিৎকার করে বললে, 'না, তোমায় বলবো না।'

তখন সৈনিকটি তলোয়ার বার করে বুড়ির মাথা কেটে ফেললো।

বুড়ি সেখানে পড়ে রইলো। কিন্তু সে কী করলে তা দেখবার জন্য সময় নষ্ট করলো না। তাড়াতাড়ি সমস্ত টাকা বুড়ির নীল অ্যাপ্রনে শক্ত করে বেঁধে একটা পোঁটলা করে পিঠে ঝুলিয়ে, চকমকির বাক্সটা পকেটে পুরে, সোজা গেলো সবচেয়ে কাছের শহরটিতে।

মস্ত ও সুন্দর শহর। সেখানকার প্রথম হোটেলটাতে ঢুকে সে সবচেয়ে ভাল ঘরে উঠে, খুব ভাল খাবারের ফরমাস দিলে। কারণ, সে এখন ধনী। খরচ করবার মতো তার অনেক সোনার টাকা।

যে চাকরটি তার বুটজোড়া পরিষ্কার করে দিলে, সে না ভেবে থাকতে পারলো না যে, এমন এক ভদ্রমহোদয়ের জুতো জোড়া বিশ্রী রকমের নোংরা, পুরনো ও ছেঁড়া। যাহোক, পরদিন সে নতুন বুট কিনলো। তাছাড়া কিনলো চটকদার পোশাক।

আমাদের সৈনিকটি এখন একজন মস্ত লোক। হোটেলটির সমস্ত বাসিন্দাদের ডাকা হলো শহরের আমোদ-প্রমোদের জায়গাগুলোতে, তাদের রাজা ও তাঁর মেয়ে, রাজকুমারীর খোঁজখবর নেবার জন্যে।

সৈনিকটি বললে, 'রাজকুমারীকে আমি দেখতে চাই। বলুন দেখি কখন তা পারা যাবে?'

তারা জবাব দিলে, কেউ তাকে দেখতেই পায় না। সে থাকে মস্ত এক তামার প্রাসাদে। তার চারদিকে অনেক দেয়াল আর টাওয়ার। রাজা ছাড়া আর কেউ সেখানে যেতে, তার সঙ্গে দেখা করতে পারে না। কারণ, ভবিষ্যদ্বাণী হয়েছে যে, সে বিয়ে করবে এক সাধারণ সৈনিককে। আমাদের রাজা তা আদৌ পছন্দ করেন না।'

সৈনিকটি ভাবলে তাহলেও একটি বারের জন্যও তাকে দেখার ইচ্ছে করাও আমার উচিত হবে না কি?

কিন্তু তার ইচ্ছে করাই হলো বৃথা।

সে খুব আনন্দে দিন কাটাতে লাগলো। সে অবিরাম থিয়েটার দেখে, রাজার বাগানে গাড়ি হাঁকায়, গরিবদের ভিক্ষে দেয়, বস্তুত যারাই তার কাছে হাত পাতে সে তাদেরই কিছু না কিছু দেয়।

কাজটা তার পক্ষে ভালই হলো। কারণ, অতীত অভিজ্ঞতা থেকে জানতো পকেটে কিছুই না থাকা কী কষ্টের।

সর্বদা পরে থাকতে লাগলো ঝলমলে পোশাক। তার চারধারে বন্ধু-বান্ধব। তারা বলতে লাগলো সে অতি চমৎকার লোক, খাঁটি ভদ্রলোক। তাতে আমাদের সৈনিকটি যার-পর-নাই খুশি হলো।

কিন্তু সে প্রত্যহ দান ও খরচ করতে লাগলো, প্রতিদানে পেল না কিছুই। তাই তার টাকা ফুরিয়ে যেতে লাগলো। অবশেষে তার পকেটে রইলো মাত্র দুটি পয়সা। সে এতদিন যে চমৎকার ঘরগুলোতে ছিলো সেগুলো ছেড়ে একখানি টিনের কোঠায় গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো। সেখানে সে নিজের হাতে তার বুটজোড়া পালিশ ও পোশাক সেলাই করে নিতে লাগলো। চিলেকোঠায় উঠতে অনেক সিঁড়ি ভাঙতে ও ক্লান্ত হতে হবে বলে তার বন্ধুরাও তার সঙ্গে আর দেখা করতে এলো না।

সেদিনকার সন্ধ্যা খুব অন্ধকার। সামান্য একটি বাতি কেনবার সামর্থ্যও তার নেই। যাহোক তার হঠাৎ মনে পড়লো, ডাইনী বুড়ি তাকে দিয়ে গাছের খোঁদল থেকে যে চকমকির বাক্সটা আনিয়েছিলো, তার ভেতর কয়েকটা কাঠি আছে।

তখন সে চকমকির বাক্সটা বার করে আলো জ্বালবার জন্যে তার গায়ে একটা কাঠি ঘষতে লাগলো। কিন্তু চকমকির পাথরটা ঘষে আগুনের ফুলকি বার করবার সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে গেলো। আর গাছের খোঁদলে চায়ের পেয়ালার মতো বড় চোখওয়ালা যে কুকুরটাকে সে দেখেছিলো, সেটা তার সামনে দাঁড়িয়ে বললে, 'দাসের প্রতি প্রভুর কী আজ্ঞা?'

সৈনিক বলে উঠলো, 'আরে! এ যে দেখি খাশা তামাশা। আমি যা চাই এটা যদি আমায় তা দেয় তাহলে তো এটা চমৎকার চকমকির বাক্স!' তারপর কুকুরটাকে বললে, 'এক্ষুণি আমায় কিছু টাকা এনে দাও!'

এই কথায় কুকুরটা অদৃশ্য হলো। আর, আধ মিনিটের মধ্যেই পয়সাভরা একটা মস্ত থলি মুখে করে নিয়ে সে ফিরে এলো।

এইভাবে সৈনিকটি সেই মন্ত্রভরা চকমকির বাক্সটার দুর্লভ গুণ বুঝতে পারলো। চকমকি পাথরে যদি সে একবার ঘা দেয়, তাহলে পয়সাভরা সিন্দুকের ওপর যে কুকুরটা বসে আছে, সে তাকে এনে দেবে পয়সা ; যদি দুবার ঘা দেয়, তাহলে যে কুকুরটা চাঁদির টাকা পাহারা দিচ্ছে সে তার ডাকে সাড়া দেবে ; আর যদি তিনবার ঘা দেয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসবে সেই সোনার ভাণ্ডারের ভয়ংকর পাহারাদারটি।

সৈনিকটি এবার তার রাজকীয় ঘরে ফিরে যেতে পারে। সে নিজের জন্যে সম্পূর্ণ নতুন পোশাক কিনলো। তার পুরনো বন্ধুদের কথা মনে পড়লো। তারা আবার তাকে আগের মতোই ভালবাসতে লাগলো।

কিন্তু একদিন সন্ধ্যায় তার মনে হলো, 'বাস্তবিক এ'কী অদ্ভুত যে এই রাজকুমারীর সঙ্গে কাউকে দেখা করতে দেওয়া হয় না! সব লোকে বলে, সে এমন সুন্দরী। কী লজ্জার কথা যে তাকে ঐ প্রকাণ্ড তামার প্রাসাদে পুরে রাখা হয়েছে, আবার চারধারে টাওয়ার দিয়ে পাহারা দেওয়া হচ্ছে। আমি তাকে দেখতে চাই। আমার চকমকির বাক্সটা গেলো কোথায় ?'

সে চকমকিতে ঘা দিতেই তার সামনে এসে দাঁড়ালো, চায়ের পেয়ালার মতো বড়-বড়-চোখ কুকুরটা।

সৈনিকটি বললে, 'স্বীকার করতেই হবে, এখন অনেক রাত। কিন্তু রাজকুমারীকে আমার এখন দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। মাত্র এক মিনিটের জন্যে, বুঝলে ?'

কুকুরটা তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল এবং সৈনিকটি কী বলবে বা করবে তা ভাবার আগেই কুকুরটা ঘুমন্ত রাজকুমারীকে পিঠে বসিয়ে নিয়ে ফিরে এলো।

আসল রাজকন্যা বটে! এমন সুন্দরী, এমন মনভোলানো সুন্দর!



তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে তার হাতে চুমো দিলো।

সৈনিকটি নিজেকে আর সামলাতে পারলো না : তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে তার হাতে চুমো দিল।

ঠিক সেই মুহূর্তে কুকুরটা রাজকন্যাকে প্রাসাদে ফিরিয়ে নিয়ে গেলো। যাহোক, পরদিন সকালে রাজকন্যা যখন রাজা ও রানীর সঙ্গে বসে প্রাতরাশ করছিল, রাজকুমারী বললে, গত রাতে সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছে। সে স্বপ্ন দেখেছে যে, সে যেন একটা প্রকাণ্ড কুকুরের পিঠে চড়ে ছিল আর পাশে একজন সৈনিক হাঁটু গেড়ে বসে তার হাতে চুমু দিলে।

রানী বলে উঠলেন, 'সুন্দর স্বপ্ন বটে ?'

তিনি বললেন, 'পরের রাতে রাজসভায় এক বয়স্কা মহিলা তার বিছানার পাশে থেকে তাকে পাহারা দেবে, যাতে কোনো স্বপ্ন তার ঘুমের ব্যাঘাত করতে না পারে।'

এদিকে সৈনিকটি সেই তামার প্রাসাদের সুন্দরী রাজকন্যাকে দেখবার জন্য খুবই ব্যাকুল হলো, তাই পরদিন রাতে তাকে আনবার জন্যে আবার কুকুরটাকে ডাকলো। সেও এসে যত জোরে পারলো রাজকন্যাকে পিঠে নিয়ে ছুটলো। কিন্তু যে বুড়ি রাজকন্যার বিছানার পাশে পাহারায় ছিল, তত জোরে পারলো না। সে কুকুরটার পিছনে ধাওয়া করবার আগেই জুতো পরবার মতো সময় সে মাত্র পেলো।

সে দেখলো, কুকুরটা একটি প্রকাণ্ড বাড়ির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো। তখন সে মনে মনে বললে ঃ 'এখন কী করতে হবে, জানি।'

এক টুকরো খড়িমাটি বার করে তাই দিয়ে সে দরজার গায়ে মস্ত ঢ্যারা দিল। তারপর সে বাড়ি ফিরে গিয়ে বিশ্রাম করতে লাগলো ; রাজকন্যাও তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ফিরলো।

কিন্তু যে হোটেলে সৈনিকটি থাকতো, তার দরজার গায়ে ঢ্যারাটা যাবার পথে কুকুরটার চোখে পড়লো, তাই সে তৎক্ষণাৎ এক টুকরো খড়ি নিয়ে শহরের প্রত্যেক বাড়ির দরজায় ঢ্যারা দিলে।

খুব সকালে রাজা, রানী এবং সেই বুড়ি, রাজবাড়ির সমস্ত বড়ো

বড়ো কর্মচারী বার হলেন। রাজকন্যা কোথায় ছিলো, তা দেখবার জন্যে প্রত্যেকেই কৌতূহলী।

রাস্তার ওপর প্রথম সদর দরজার গায়ে ঢ্যারা দেখেই রাজা বলে উঠলেন, 'এই যে!'

দ্বিতীয় দরজার গায়ে ঢ্যারা দেখে রানী বলে উঠলেন, 'হ্যাঁগো, তোমার চোখ দুটো কোথায়, এই সেই বাড়ি!'

সকলে সবগুলো দরজায় ঢ্যারা দেখে একসঙ্গে বলে উঠলো, 'না —নির্ঘাত এইটে—এই যে, এর গায়েও ঢ্যারা।' এটা বেশ স্পষ্ট হলো যে, তল্লাস করা বৃথা। তাই তাঁরা তল্লাসী ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন।

কিন্তু রানী ছিলেন খুব বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণা।...তাঁর সোনার কাঁচিখানা নিয়ে, বেশ বড় একখানা রেশমের কাপড় ফালি করে কাটলেন এবং সেগুলো একসঙ্গে সেলাই করে একটি ছোট্ট সুন্দর থলি করলেন। সেই থলিটি খুব মিহি। খুব সাদা ময়দা ভরে নিজের হাতে রাজকন্যার কোমরে বেঁধে দিলেন। সেটা করার পর সোনার কাঁচিখানি আবার নিয়ে তা দিয়ে থলিটি এমন একটি ছোট ফুটো করলেন, যার ভেতর দিয়ে রাজকুমারী যতক্ষণ চলাফেরা করবে ততক্ষণ একটু একটু করে ময়দা পড়বে।

সে রাতে কুকুরটা আবার এসে রাজকন্যাকে পিঠে নিয়ে সৈনিকটির কাছে গেলো। আহা! সৈনিকটি তাকে কতো ভালোবাসে! তার মন চাইতে লাগলো, সে রাজপুত্র হোক। তাহলে সুন্দরী রাজকন্যাকে তার স্ত্রীরূপে পেতে পারবে।

কুকুরটা বুঝতেই পারলো না, কী করে সারা পথ সেই সৈনিকের ঘর এবং সেখান থেকে রাজবাড়ি অবধি ঝুরঝুর করে ময়দা পড়ছে। তাই পরদিন সকালে, রাজা-রানী সহজেই আবিষ্কার করতে পারলেন, তাঁদের মেয়েকে কোথায় বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। সৈনিকটিকে ধরে কয়েদখানায় পোরা হলো।

এখন সে কয়েদখানায় বসে রইলো। ওঃ, সে কী অন্ধকার! কী

ক্লান্তিকর! আরদালি বারবার এসে তাকে মনে করিয়ে দিয়ে যেতো লাগলো, কাল তার ফাঁসি হবে।

এই মরণটা আদৌ সুখের নয়। হোটেলের বাসায় সে তার চকমকির বাক্সটা ফেলে এসেছে। সকাল হলে সে অপরিসর লোহার গরাদের মধ্যে দিয়ে দেখতে পেল, লোকে তার ফাঁসি দেখতে তাড়াতাড়ি শহরের বাইরে চলেছে। সে ঢাকের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল। আর, তখনই দেখতে পেল সৈন্যেরা কুচ্‌কাওয়াজ করতে করতে বধ্যভূমির দিকে চলেছে। কী লোকের ভিড় ছুটছে। তাদের মধ্যে ছিলো একটা মুচির শিক্ষানবিশ ছোকরা; তার গায়ে চামড়ার অ্যাপ্রন, পায়ে স্লিপার। সে এত তাড়াতাড়ি হাঁটছিলো যে, তার একপাটি স্লিপার পা থেকে খুলে ছুটে গিয়ে লাগলো, সৈনিকটি যে কয়েদঘরে ছিল তার গরাদে।

সৈনিকটি বলে উঠলো, 'থামো, থামো ছোকরা! এত তাড়াতাড়িতে তোমার কোনো কাজ হবে না। কারণ, আমি যতোক্ষণ না যাচ্ছি, ততোক্ষণ তামাশা শুরু হচ্ছে না। কিন্তু তুমি যদি ছুটে আমার বাসায় গিয়ে আমার চকমকির বাক্সটা এনে দাও, তাহলে তোমায় দুটো পয়সা দেব। কিন্তু তোমাকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে হবে।'

শিক্ষানবিশ মুচি-ছোকরার দুটি পয়সা রোজগার করার মতলবটা ভালো লাগলো। তাই সে চকমকির বাক্সটা আনতে ছুটলো এবং ফিরে এসে সৈনিকটিকে সেটা দিলো—আর, তারপর, হ্যাঁ, এবার আমরা শুনবো, তারপর কী হলো।

শহরের বাইরে পোঁতা হয়েছিলো একটা ফাঁসিকাঠ; সেটাকে ঘিরে জড় হয়েছিল একদল সৈন্য। তাদের সঙ্গে ছিল হাজার হাজার মানুষ—পুরুষ, মেয়ে ও বালক-বালিকা। রাজা-রানী বসেছিলেন জমকালো সিংহাসনে, বিচারপতি ও মন্ত্রী-পরিষদের ঠিক উল্টো দিকে।

ততক্ষণে সৈন্যেরা মইয়ের একেবারে মাথায় উঠেছে। জল্লাদ সৈনিকটির গলায় ফাঁস পরায় আর কী, এমন সময়ে সে রাজা-রানীর

দিকে ফিরে খুব অনুনয়-বিনয় করে প্রার্থনা জানাতে লাগলো যে এক হতভাগ্য অপরাধীকে শাস্তি দেবার আগে তার একটা নির্দোষ বাসনা পূরণ করবার অনুমতি দিন। সে বললে, তার ইচ্ছে, সে পাইপে তামাক ভরে ধূমপান করে। পৃথিবীতে এই তার শেষ সুখ। সে আশা করে, তা থেকে সে বঞ্চিত হবে না।

রাজা এই নির্দোষ অনুরোধ না-মঞ্জুর করতে পারলেন না। তখন সৈনিকটি তার চকমকির বাক্সটি বার করে চক্‌মকিতে ঘষলো। সে ঘষলো একবার, ঘষলো দুবার, ঘষলো তিনবার। অমনি সেই তিনটে ভেল্কিবাজ কুকুর তার সামনে এসে দাঁড়ালো—সেই চায়ের পেয়ালার মতো, যাঁতা-কলের চাকার মতো, গোল টাওয়ারের মতো মস্ত বড় বড় চোখ কুকুর তিনটের।

সৈনিকটি বলে উঠলো, 'এখন আমায় সাহায্য কর—আমাকে ফাঁসিতে লটকাতে দিও না।' বলার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভয়ংকর কুকুর-গুলো, বিচারপতি ও মন্ত্রী-পরিষদকে শূন্যে—এত শূন্যে ছুঁড়ে দিলে যে, তারা আবার মাটিতে পড়ে তাঁদের হাড়-গোড় ভেঙে টুক্‌রো টুকক্‌রো হয়ে গেলো।

রাজামশাই বলতে শুরু করলেন, 'এ সব আমরা পছন্দ করি না।'

কিন্তু গোল টাওয়ারের মতো প্রকাণ্ড চোখ রাক্ষুসে কুকুরটা রাজামশাই কী পছন্দ করেন না তার জন্যে অপেক্ষা করলো না; তাঁকে ও রানীকে মন্ত্রী-পরিষদের পিছু পিছু ছুঁড়ে দিলো।

সৈন্যেরা দারুণ ভয় পেয়ে গেলো; আর লোকে চিৎকার করে সমস্বরে বলতে লাগলো, সৈনিক-মশাই! আপনি আমাদের রাজা হলে সুন্দরী রাজকন্যা হবেন আপনার স্ত্রী, আমাদের রানী।'

তখন সৈনিকটিকে নিয়ে যাওয়া হলো রাজকীয় গাড়িতে; আর কুকুর তিনটে এদিক-ওদিক লাফালাফি করতে লাগলো, ছেলেরা মুখে আঙুল পুরে শিষ্‌ দিতে লাগলো, আর সৈন্যেরা কুচকাওয়াজ করে তাকে সম্মান দেখলো।

তৎক্ষণাৎ রাজকন্যাকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁকে করা হলো রানী। সেও তামার প্রাসাদে বন্দিনী থাকার চেয়ে এটাই ভালো বলে পছন্দ করলো। আটদিন বিয়ের উৎসব চললো; আর ভেল্কিবাজ কুকুর তিনটে ভোজের টেবিলে বসে বড় বড় চোখে চারধারে ড্যাব্‌ ড্যাব করে তাকাতে লাগলো।

উড়ন্ত সিন্দুক

এক সময়ে এক বণিক ছিলো। সে এমন ধনী ছিলো যে, সে যে রাস্তায় বাস করতো আগাগোড়া সেটা ছাড়াও গলিটাও রূপোর টাকা বিছিয়ে বাঁধিয়ে দিতে পারতো, কিন্তু তা সে করেনি। সে টাকা ব্যবহারের আর একটা পথ জানতো। সে যখনই একটা টাকা খাটাতো তখনই তার মুনাফা তুলতো দ্বিগুণ। জীবনে সে ছিলো বণিক, মারাও যায় বণিক থেকেই।

তখন তার সব টাকা-কড়ি যায় তার ছেলের হাতে। কিন্তু ছেলেটি জীবন-যাপন করতে থাকে স্ফূর্তিতে এবং সমস্ত সময় কাটাতে থাকে আমোদ-প্রমোদে। প্রতি সন্ধ্যায় সে যেতো থিয়েটারে, সারকাসে, ব্যাংকনোট দিয়ে তৈরী করতো ঘুড়ি এবং পুকুরের পাথরের বদলে মোহর দিয়ে খেলতো চৈ চৈ খেলা।

এইভাবে তার সব টাকা অল্পকালেই যায় উড়ে। শেষে তার কাছে থাকে গোটা কয়েক পেনি, আর পোশাক-পরিচ্ছদ এসে ঠেকে কেবল একজোড়া স্লিপার ও একটা পুরনো ড্রেসিং গাউনে। তার বন্ধুরা আর তাকে খাতির করে না ; তখন তারা আর তার সঙ্গে বাইরে বেড়াতে পারে না। তাদের মধ্যে একজন অন্যদের চেয়ে অনেকটা সৎ-প্রকৃতির ছিল। সে তাকে একটি সিন্দুক পাঠিয়ে এই উপদেশ দেয়—'ভরে নাও এবং সরে পড়।' উপদেশটা চমৎকার ; কিন্তু তার এমন কিছুই ছিলো না যে ভরে নিতে পারে। তাই সে নিজেই সিন্দুকটার মধ্যে ঢুকে পড়ে।

সিন্দুকটা ছিলো মজার। তার তালাটায় জোরে চাপ দিলেই উড়ে যেতে পারতো। বণিকের ছেলেটা তালাটায় জোরেই চাপ দিলে।

আর অমনি সিন্দুকটা তাকে নিয়ে চিমনির ভেতর দিয়ে ওপরে মেঘের মধ্যে উড়ে গেলো এবং ওপরে, আরও ওপরে উঠতে লাগলো। তালাটা গেল ফেটে। তাতে সে ভয় পেলো। কারণ, যদি সেটা দুভাগ হয়ে ভেঙে যায়, তাহলে তাকে বিষম পড়া পড়তে হবে।

যাহোক, সিন্দুকটা নির্বিঘ্নে নামলো এবং সে দেখলো, সে এসেছে তুরস্কে। একটা বনের মধ্যে কতকগুলো শুকনো পাতার তলায় সিন্দুকটা লুকিয়ে রেখে সে পরের শহরে গিয়ে ঢুকলো। কাজটা সে বেশ ভালোভাবেই করতে পারলো। কারণ, তুর্কিদের মধ্যে প্রত্যেকেই ড্রেসিং গাউন ও শ্লিপার পরে বেড়ায়। তার দেখা হলো এক নার্সের সঙ্গে। সে একটা ছোটো বাচ্চাকে কোলে নিয়ে যাচ্ছিল। বণিকের ছেলে বললে, 'শুনছো বাছা, তুর্কী নার্স! শহরের কাছে উঁচু জানলা বসানো প্রাসাদটি কিসের?

নার্সটি জবাব দিলে, 'রাজকুমারী থাকেন ওখানে। গণকে বলেছে. উনি যাকে ভালোবাসবেন তাঁর হাতে ওঁকে দুঃখ পেতে হবে। তাই রাজা-রানী যখন ওঁর সঙ্গে থাকবেন সেই সময় ছাড়া আর কেউ ওর সঙ্গে দেখা করতে পারে না।'

'ধন্যবাদ' বলে বণিকের ছেলে তৎক্ষণাৎ বনে ফিরে গিয়ে সিন্দুকটার মধ্যে বসে প্রাসাদটির ছাদে উঠে গেলো এবং জানালার ভেতর দিয়ে রাজকুমারীর ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

রাজকুমারী সোফায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিলো। সে এমন সুন্দরী যে বণিকের ছেলেটি তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে তার হাতে চুমো না দিয়ে থাকতে পারলো না। তাতে রাজকুমারীর ঘুম গেল ভেঙে এবং সেই অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎকারীকে দেখে একটুও ভয় পেলো না। কিন্তু বণিকের ছেলেটি তাকে বললে, সে হচ্ছে তুর্কী দেবদূত, আকাশ থেকে নেমে এসেছে তাকে ভালোবাসা জানাবার উদ্দেশ্যে। তাই শুনে রাজকুমারী খুব খুশি হলো।

তারা দুজনে তখন পাশাপাশি বসলো। বণিকের ছেলেটি বললে,



সে বললে, 'শনিবারে তোমার আসা চাই।'

তার চোখ দুটি গাঢ় নীল সমুদ্রের মতো' কেমন সুন্দর! তাতে রাজকুমারীর চিন্তা ও অনুভূতি মার্মেডের মতো ভাসছে ; সে তার কপালখানির প্রশংসা করলে। বললে, সেটি তুষার-ঢাকা পর্বতের মতো! তাতে রয়েছে, চমৎকার বড় বড় ঘর ও ছবি। এমনি আরও অনেক কথা বললে।

এইভাবে রাজকুমারীকে ভালোবাসা জানালো। রাজকুমারী তৎক্ষণাৎ গলে গেল।

সে বললে, 'শনিবারে তোমরে আশা চাই-ই। রাজা-রানী কথা দিয়েছেন, সেদিন সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে চা খাবেন। তাঁরা যখন শুনবেন, তুর্কী দেবদূতের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, তখন এমন খুশি হবেন! মনে থাকে যেন, তোমায় তাঁদের খুব সুন্দর একটি গল্প বলতে হবে। কারণ, তাঁরা গল্প খুবই ভালোবাসেন। আমার মা পছন্দ করেন, নীতিমূলক, খুব উঁচুদরের গল্প আর আমার বাবা পছন্দ করেন, মজার গল্প, যে গল্প তাঁকে হাসায়।'

বণিকের ছেলে জবাব দিলে, 'হ্যাঁ একটি গল্প ছাড়া কনের জন্যে আর কোনো উপহার আনবো না।'

এখানে তারা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলে। তার আগে রাজকুমারী তাকে দিলো, আগাগোড়া সোনা দিয়ে মোড়া একখানি তলোয়ার।

বণিকের ছেলে খুব ভালো কারই জানতো সেটা দিয়ে কাজ করতে হয়।

তাই সে উড়ে চলে গেলো ; একটি নতুন ড্রেসিং গাউন কিনলো। তারপর সেই বনে বসে, শনিবারের মধ্যে যে গল্পটি প্রস্তুত রাখতে হবে, সেটি রচনা করতে লাগলো। কিন্তু সে অবশ্যই দেখলো, জগতে গল্প রচনা করা সবচেয়ে সহজ কাজ নয়।

অবশেষে সে প্রস্তুত হলো : এলো শনিবার।

রাজা, রানী ও সভাসদগণ সকলে রাজকুমারীর প্রাসাদে তার জন্যে

চা নিয়ে অপেক্ষা করেছিলেন। বরকে সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা করা হলো।

রানী তাকে জিগ্যেস করলেন, 'তুমি কী আমাদের একটি গল্প বলবে না, যে গল্পটি শিক্ষামূলক হবে এবং যার মধ্যে থাকবে গভীর অর্থ ?'

রাজা বললেন, 'কিন্তু যা আমাদের হাসাবে !'

বণিকের ছেলে জবাব দিলে, 'নিশ্চয়ই।'

আর এবার তোমাদের তার গল্পটি শুনতেই হবে।

"এক সময়ে একগোছা দেশালাইয়ের কাঠি ছিল। তারা সকলেই উচ্চ বংশ-সম্ভূত বলে খুব গর্বিত ছিলো। কারণ, তারা ছিলো লম্বা দেওদার গাছ থেকে তৈরি কাঠি। সেই কাঠিগুলোর মধ্যে একটি কাঠি ছিলো বেশ বিশিষ্ট। কারণ সে ছিলো বনের সবচেয়ে উচু দেওদার গাছের কাঠি। এখন, সেই দেশালাইয়ের কাঠিগুলো ম্যানটেল-পিসের ওপর পড়েছিলো একটা চকমকির বাক্স আর একটি পুরনো লোহার প্যানের মাঝখানে। এই দুটোর সঙ্গে তারা প্রায়ই তাদের কালের গল্প করতো।

"তারা বলতো, 'আহা ! আমরা যখন সবুজ কাঁচা ডালগুলোর ওপর ছিলাম অর্থাৎ যখন সবুজ কাঁচা ডালাগুলোতে বাস করতাম তখন ছিল সুখের সময়। প্রতি সকাল আর সন্ধ্যায় পেতাম শিশিরের স্পর্শ ; সারাদিন ধরে পেতাম রোদ, অন্তত যখনই সূর্য কিরণ দিতো ; আর, আমাদের গল্প বলতো ছোট ছোট পাখিরা।

"সহজেই এটাও দেখা যেতে পারে যে, আমরা ছিলাম ধনী। কারণ, যেখানে অন্য গাছগুলো কেবল গ্রীষ্মে পাতার পরিচ্ছদ পরতো, আর সেখানে আমাদের পরিবারের শীত-গ্রীষ্ম দু-সময়েই সবুজ পরিচ্ছদ পরার সামর্থ্য ছিলো।

"কিন্তু অবশেষে এলো কাঠুরেরা। তখন হলো বিরাট বিপ্লব। আমাদের বংশকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হলো। মূল গুঁড়িটি একখানি সুন্দর জাহাজের প্রধান মাস্তুলের কাজ পেলো, যেটা মনে করিলেগোটা

পৃথিবী ঘুরতে পারতো। ডাল-পালাগুলো নানা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হলো ; আর, তখন থেকে আমাদের বৃত্তি হলো, নিম্নস্তরের সাধারণ মানুষের জন্যে আলো জ্বালা। এখন তোমরা বুঝতে পারবে, আমাদের মতো উঁচু বংশীয় ব্যক্তিরা কেমন করে রান্নাঘরে বাস করছে।

"যে লোহার প্যানটির কাছে দেশলাইয়ের কাঠিগুলো পড়ে ছিলো, সে মন্তব্য করলে, 'আমার হচ্ছে আলাদা ইতিহাস। যে মুহূর্তে আমি এই জগতে এসেছি, তখন থেকে এখন পর্যন্ত আমাকে বারবার ঘষা-মাজা আর সিদ্ধ করা হচ্ছে, ওঃ! সে কতোবার। যার সবটুকু ভালো আমি তা করতে ভালোবাসি ; আর, এই বাড়িতে আমি বাস্তবিকই প্রথম নম্বরের দরকারী।

"আমার একমাত্র বিশ্রাম হচ্ছে, খাওয়া-দাওয়ার পর এই ম্যানটেলপিসের ওপর পরিষ্কার আর ঝকঝকে হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আর আমার সঙ্গীদের সঙ্গে কিছু যুক্তিপূর্ণ কথাবার্তা বলা। যাহোক, জলের কলসীটি ছাড়া, ও মাঝে মাঝে বেরিয়ে যায় উঠোনে, আমরা সকলেই এখানে শান্ত ঘরোয়া জীবন-যাপন করি। আমাদের একমাত্র সংবাদদাতা হচ্ছে, ঘাসের ঝুড়িটা। কিন্তু ও 'সরকার' আর 'জনগণ' সম্বন্ধে এমন গণতান্ত্রিক ধরনের কথা বলে—সত্যি বলছি, বেশি আগে নয়, তা শুনে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতো যে পুরনো জারটা সে মনে এমন আঘাত পায় যে, ম্যানটেলপিসটার ওপর থেকে পড়ে হাজার টুকরো হয়ে যায়। ঐ ঘাসের ঝুড়িটা হচ্ছে, উদারপন্থী, এটা একদম সতি।

"চক্‌মকির বাক্‌সটা বাধা দিয়ে বললে, 'তুমি বড় বেশি কথা কও'। আর চক্‌মকিটা ইস্পাতে এমন ঘা দিলে যে, ফুলকি বেরিয়ে এলো। কেন আমরা একটা আনন্দময় সন্ধ্যা কাটাবে না?'

"মেটে কলসীটা আপত্তি জানালো, 'আরে না। আমার দিক থেকে আমি নিজের সম্বন্ধে কিছু বলবো না। ধর, আমরা যদি একটা জ্ঞানগর্ভ আমোদ করি? আমি শুরু করবো ; আমি বলবো দৈনন্দিন জীবনের কিছু যা আমরা সকলেই ভোগ করেছি। যে কেউ তার

মধ্যে নিজেকে নিয়ে যেতে পারে ; আর, সেটা এমন আকর্ষণীয় হবে! বালটিক সাগরের কাছে, ডেনমার্কের বীচ-উপবনের মধ্যে—'

"সবগুলো প্লেট বলে উঠলো, 'সুন্দর আরম্ভ ! এটা নিশ্চয় আমার উপযোগী গল্প হবে—'

"হ্যাঁ, সেখানে একটি খুব শান্তশিষ্ট পরিবারের মধ্যে আমার যৌবন কাল কাটিয়ে ছিলাম। আসবাব-পত্রগুলো মোছা হতো, মেঝেগুলো ধোয়া হতো, প্রতি পনেরো দিন অন্তর পরিষ্কার পর্দা টাঙানো হতো—'

"মাথার চুলের বুরুশটা বললে, 'কেমন আকর্ষণীয় ! তোমার বর্ণনা করার কায়দাটা কী রকম মন-ভোলানো। যে-কেউ মুহূর্তে মনে করবে, কোনো ভদ্রমহিলা কথা কইছেন। গল্পটা এখন পরিচ্ছন্নতার আমেজ ছাড়ছে !'

"জলের কলসীটা বলে উঠলো, 'কতো সত্যি ! তাই বটে' ; এবং আনন্দের আতিশয্যে সে একটু লাফিয়ে উঠলো। তার ফলে মেঝেতে একটু জল ছিট্‌কে পড়লো।

"মেটে কলসীটা তার গল্পটি বলে যেতে লাগলো। তার শেষটা হলো শুরুর মতোই ভালো।

"প্লেটগুলো খড়্ খড়্ করে আনন্দধ্বনি করে উঠলো। আর, চুলের বুরুশটা বালির গর্তটার ভেতর থেকে কতকগুলো কাঁচা শাক তুলে সেগুলো কলসীটার মাথায় পরিয়ে দিলে। কারণ সে জানতো তাতে অন্যেরা বিরক্ত হবে। আর ভাবলো, 'আজ আমি যদি ওকে মুকুট পরাই কাল ও আমাকে মুকুট পরাবে।'

"চিমটেটা বললে, 'এবার আমি নাচবো।' আর সে নাচালোও! ওঃ! সে একখানা পা কতো শূন্যে তুলে দিলে। চমৎকার দেখাতে লাগলো।

"কোণেতে চেয়ারের পুরনো ঢাকনাটা তাকে দেখানো সম্মানে ছিঁড়ে গেলো।

"চিমটে জিগ্যেস করলে, 'আমাকে মুকুট পরানো হবে না?' তাকে তৎক্ষণাৎ মুকুট পরানো হলো।

"দেশলাইয়ের কাঠিগুলো ভাবলে, 'এ সব ইতর লোকের জটলা।'

"তখন চায়ের পাত্রটাকে গান গাইতে ডাকা হলো। কিন্তু তার ঠাণ্ডা লেগেছিলো। সে বললে, যখন সে গরমে ফোটে কেবল তখনই গান গাইতে পারে। যাহোক, এসব তার দেমাক আর ঠাটের কথা। আসল ব্যাপার হচ্ছে, সে যখন বৈঠকখানার টেবিলে লোকজনের সামনে বসানো থাকে কেবল তখনই তার গান গাইবার মর্জি হয়।

"জানালার ধারে পড়ে ছিলো একটু পুরনো হাঁসের পালকের কলম। সেটা দিয়ে চাকরানীরা লিখতো। তাকে কালির মধ্যে অনেকটা ডোবানো হয়েছিল, এটুকু ছাড়া, তার গায়ে আর কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না। যাহোক, সেজন্যে তার দেমাক ছিলো। সে বললে 'চায়ের পাত্রটা যদি গাইতে না চায়, তাহলে তাকে ছেড়ে দাও। ঠিক বাইরেই খাঁচায় ঝুলছে, একটা নাইটিংগেল, সে গাইতে পারে। এটা নিশ্চিত যে, ও তাল-মান-লয় শেখেনি। তাতে কিছু এসে যায় না— আজকের সন্ধ্যায় আমরা কারো নিন্দা করবো না।'

"চায়ের কেটলিটা রান্নাঘরের চড়াগলার গাইয়ে, চায়ের পাত্রটার আধা-ভাই। বললে, 'আমি এটা অসঙ্গত মনে করি যে, একটা বিদেশী পাখির গান শুনতে হবে! এটা কী দেশ-প্রেমমূলক? আমি মাঠের ঘাসের ঝুড়ির কাছে আবেদন করছি।'

"মাঠের ঘাসের ঝুড়ি বললে, 'আমি বিরক্তি বোধ করছি, বিরক্তি বোধ করছি, সর্বান্তঃকরণে যে, এ রকম কিছু আদৌ ভাবা যেতে পারে। একটা সন্ধ্যা কাটাবার এটা কী সঙ্গত উপায়? গোটা বাড়িটাকে সংশোধন করা কী যুক্তিযুক্ত হবে না, এবং সবকিছুর সম্পূর্ণ নতুন বিন্যাস স্থাপন, বরং স্বভাব অনুসারে? তখন প্রত্যেকেই তার ঠিক জায়গাটি নিতে পারেন, আর আমি বিপ্লবের ভার নেবো। এ সম্বন্ধে আপনারা কী বলেন? এই কাজই যোগ্য হবে!'

"সকলে বলে উঠলো, 'নিশ্চয়। আমরা মহা গোলমাল বাধাবো। ঠিক তখনই দরজাটা গেলো খুলে, এলো চাকরানী। সকলে একদম স্থির হয়ে রইলো ; একজনও নড়তে সাহস করলো না। তবু তাদের মধ্যে রান্নার একটি বাসনও ছিল না, যে ভাবছিলো না কতোবড়োবড়ো কাজ সে করতে পারতো আর অন্যদের চেয়ে সে কত উঁচুস্তরের!

"তারপর প্রত্যেকে ভাবতে লাগলো ; 'আহা! যদি মনে করতাম, তাহলে আমরা কতো আনন্দময় সন্ধ্যা পেতে পারতাম!

'চাকরানী দেশলাই ঘষে আলো জ্বাললো—ওঃ! তারা কীরকম চটপট করতে লাগলো আর উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

'তারা ভাবলে, এখন প্রত্যেকেই দেখতে পারে যে, আমরা সর্বোচ্চ শ্রেণীর। কী চমৎকার, চোখ ধাঁধানো আলো দিয়ে থাকি—কী মহান্!' এবং পরমুহূর্তেই তারা পুড়ে গেলো।"

রানী বললেন, 'গল্পটি খাশা। আমার বোধ হচ্ছিল, যেন আমি নিজেই রান্নাঘরে চলে গেছি। হ্যাঁ 'তুই' আমাদের মেয়েকে পাবি।'

রাজা বললেন, 'সর্বান্তঃকরণে। সোমবারে তুই আমাদের মেয়েকে বিয়ে করবি।' তাঁরা এখন বণিকের ছেলেকে 'তুই' বলে সম্বোধন করলেন। কারণ, সে শীঘ্রই তাঁদের পরিবারের একজন হতে চলেছে।

বিয়েটা পাকাপাকি হয়ে গেলো। আগের সন্ধ্যায় সারা শহর আলোকিত করা হলো। জনসাধারণের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলা হতে লাগলো, কেক, বাম্ ও মিছরি। রাস্তার ছেলেরা সব ডিঙি মেরে দাঁড়িয়ে 'হুররে' বলে চিৎকার করতে লাগলো আর মুখে আঙুল পুরে শিষ দিতে থাকলো—চমৎকার!

বণিকের ছেলেটি ভাবলে, মনে হয় আমার দিক থেকেও কিছু করা উচিত। তাই সে হাউই, পটকা, চরকি, মোমবাতি এবং যত রকমের ভাবা যেতে পারে সব রকমের আতস-বাজি কিনে সেগুলো তার ট্রাংকে পুরে শূন্যে উড়লো এবং উড়তে উড়তে সেগুলো ছুঁড়তে লাগলো!

বাহ্‌বা! সেটা হলো কী চমৎকার হাউই!

তুর্কীরা দেখবার জন্যে এমন তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠলো যে, তাদের স্লিপারগুলো পা থেকে খুলে কানের পাশ দিয়ে উড়ে যেতে লাগলো। এ রকমের উল্কা তারা আগে কখন দেখেনি। এখন তারা নিশ্চিত হতে পারলো যে, বাস্তবিকই দেবদূতই তাদের রাজকুমারীকে বিয়ে করবেন।

বণিকের ছেলেটি তার ট্রাংকে চড়ে বনে ফিরে এসেই মনে মনে বললে, 'এখন শহরে যাব আর শুনবো লোকে আমার সম্বন্ধে কী বলছে আর শূন্যে আমায় কী রকম দেখাচ্ছিলো।' নিশ্চয়ই তার এই ধারণাটা খুবই স্বাভাবিক।

ওঃ! কী সব অদ্ভুত বিবরণ। যার সঙ্গেই তার দেখা হয়, তাদের প্রত্যেকেই দেখেছিল শূন্যে উজ্জ্বল ছায়া, নিজের নিজের মতো করে। তবে সকলেই একমত হলো যে, সেটা ছিল আশ্চর্য রকমের সুন্দর।

একজন বললে, 'মহান দেবদূতকে স্বচক্ষে দেখেছি। তাঁর চোখ দুটি ছিলো তারার মতো জ্বলজ্বলে, দাড়ি ছিল ফেনিয়ে ওঠা জলের মতো।'

আর একজন বললে. তিনি আগুনের চাদর জড়িয়ে উড়ছিলেন। আর সবচেয়ে সুন্দর ছোটো ছোটো দেবশিশুরা সেই চাদরের ভাঁজের মাঝ থেকে উঁকি দিচ্ছিল।'

হ্যাঁ · সে শুনলো, অনেক সুন্দর সুন্দর কথা। আর, আগামীকালই তার বিয়ের দিন।

সে আবার সিন্দুকের মধ্যে ঢোকবার জন্যে ফিরে গেলো বনে; কিন্তু কোথায় সেটা?

হায়! সিন্দুকটা গেছে পুড়ে। বাজির একটা ফুলকি তার মধ্যে থেকে গিয়েছিলো। আর, তাতেই আগুন ধরে যায়। সিন্দুকটা এখন ছাই হয়ে পড়ে ছিলো। বেচারী বণিকের ছেলেটি আর উড়তে পারবে না, আর, তার কনের কাছে যেতে পারবে না।

মেয়েটি সারাদিন, সারাজীবন ধরে বণিকের ছেলেটির আশায় তার প্রাসাদের ছাদে বসে রইলো—সে এখনও তার আশায় আছে।

ইতিমধ্যে বণিকের ছেলেটি পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায় আর গল্প বলে। কিন্তু তার কোনো গল্পই রাজকুমারীর প্রাসাদে দেশলাই কাঠির যে গল্পটি সে বলেছিলো, সেটির মতো আনন্দদায়ক নয়।
